KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫, [illegible] লেন, কল-৩৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
Title : অন্তরীপ (ANTAREEP)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 3/3 3/4 12 12	Year of Publication : [illegible] সংকলন ১৯৮৮ 1988 May 1990 May 1991
	Condition : Brittle Good
Editor : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়	Remarks

CD Rom No : KLMLGK

কবিতা : সঙ্গ-অনুষঙ্গ সংখ্যা

অন্তরীপ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নিজস্ব নির্মাণের নেপথ্যে ঃ
কবিতা ঃ ৩টি নিবন্ধ

শিবশম্ভু পাল ব্রত চক্রবর্তী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্প ঃ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

সুনীলকুমার নন্দী তারাপদ রায় অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মনিভূষণ ভট্টাচার্য মতি মুখোপাধ্যায় প্রমোদ বসু সুভাষ মজুমদার রাত্রি ভট্টাচার্য সোমক দাশ দীপক কর সুজিত সরকার কৃত্তিবাস রায় বিশ্বনাথ গরাই শৈলেন্দ্র হালদার কাশীনাথ বসু জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

আপাতসাফল্যে কবিতা ঃ
কবিতার ক্রান্তিকাল

প্রবন্ধ ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

স্মরণ ঃ সমর সেন

সম্পাদনা : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

With best

compliments from :

Haripada Dutt & Co.

2, Maharshi Debendra Road
Calcutta-7

Pioneer dealer of Paints, Coal-tar by-products & general order suppliers

শ্রী সন্দীপ দত্ত

আনন্দে, আন্তরিকতায়,

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয় ॥

এক-একটা কবিতা এক-এক ভাবে হয়ে ওঠে, এক-এক ভাবে গড়ে তোলে তার নিজস্ব শরীর-আত্মা-মন, এক-এক ভাবে সফলতার মুখ দেখে, অহঙ্কারী হয়, শব্দে-শব্দে টেরা-কোটার ভাস্কর্যে কখনো, কখনো-বা বিষয়ের একান্ত গোপন আপনতায়। কবি আর তার পাঠককে উপেক্ষা না করেও একটা তৃতীয় ভুবনের নির্মাণ সম্ভব হয়। এক-একটা কবিতা ব্যর্থ হয়, দাঁড়াতে পারে না, চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে, বাইরে পৃথিবীটায় তার জন্য কোনো বিপ্লব হয় না, বিজ্ঞাপন পড়ে না, কোলাহল শুনি না। তবু এক নির্জনতা-বাসী দুঃখী কবির মুখ জেগে ওঠে,—কবিতাটা

অন্য রাস্তায় লেখা হলে কেমন হত, দাঁড়াত ?
—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওই প্রশ্নটার থেকেও প্রবলতর আরেকটা প্রশ্ন আমাকে নাড়া দেয়, তার অরোধ্য এক তাড়না অনুভব করি, নিজের মধ্যেই, 'রাস্তা' না 'পথ'—কোন্ শব্দটা এখানে বসাতে চেয়েছিলাম ? পথের বদলে যে রাস্তা ধরলাম, এই বিকল্প শব্দেই কি উত্তীর্ণ হতে পারবে আমার ঠিক ওই মুহূর্তের বলবার যা কিছু ছিল তা ? মস্ত সুবিধে যে, এটা গদ্য,—সূক্ষ্ম পথ ছেড়ে রুক্ষ রাস্তায় যার চলবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু কবিতায় ? প্রয়োজনে তো সেখানে 'রাস্তা' বাতিল হতে পারত, সুদূরতার সংকেতবাহী ওই 'পথ'-ই তখন নির্বাচিত জীবন্ততম শব্দ। আসলে একটা কবিতার দাবি বুঝে নিতে হবে,—কোন্ পথে দাঁড়াবে সে, কোন্ শব্দে তার উদ্বোধন ঘটাতে হবে, কোথায়। শব্দ আর তার নিকটতম প্রতিশব্দ—চলমান ট্রেনের কামরাগুলোর মত একরকম দেখতে লাগলেও কত অন্যরকম ; একমাত্র কবিকেই জেনে নিতে হয় দুটো যমজ শব্দের মধ্যেও ভিন্নতা কোথায়, শুধুমাত্র ব্যঞ্জনায় ঘটে যায় কি বিপুল প্রভেদ, কি নীরব বিরাট বিপ্লব। শব্দের প্রকৃত বোধে সজাগ হতে হয় তার নির্মাতাকে।

বাঁকের মুখে পৌঁছেছি

□ প্রবন্ধ

ব্রত চক্রবর্তী

এক

টের পাই আমি ও আমার কবিতা আবার একটা বাঁকের মুখে পৌঁছেছি। প্রত্যেকটা বাঁকের মুখে দ্বিধা, ভয়, অস্থিরতা। শিহরণ। যাবো কি যাবো না ভাব। নাই-বা আর গেলাম এমন ভাবনারও শিকার হই কখনও। কিন্তু এসব সাময়িক। বাঁক পেরবার মুখে সহ্য করতে হয় একটু বেশি। তারপর সয়ে যায়। পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে যখন ফেলে-আসা দশবছরকে দেখি, চোখে পড়ে যে, হ্যাঁ, আমি আসছি। থেমে পড়িনি। এই গতিশীলতাই নানান দুর্যোগ, বাধা, কাঁটা পাথর আগুনের হলকার ভেতর আমাকে টিকিয়ে রেখেছে। যে কথা বলছিলুম। বাঁকের মুখে। ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে : 'মোড় বেঁকানোর সময়, মোটরগাড়ী, একটু আস্তে চালানো উচিত।' আমি তাই করি। বাঁকের মুখে গাড়ী আস্তে চালাই। বাইরে যত অস্থিরতা, জীবন যত অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যে ছুঁড়ে আমাকে ধ্বংস করতে চায়, ভেতরে ভেতরে আমি তত স্থির হয়ে যাই। জিদ বাড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রত্যেকমুহূর্তে বলি : যেতে আমাকে হবে। হবে-ই। যত বিপজ্জনকই হোক্, আমি পেরিয়ে যাবো। যখন জীবন খুব নিগ্রহ করে তখন পাল্টা ভয় দেখাই আমি ওকে : জিন্দেগী মেরা মুঠ্ঠি মে নেহি হ্যায়, লেকিন মত্ (মৃত্যু) তো হ্যায়। ব্যস, ও নার্ভাস হয়ে যায়। ওর কোর্টে এই যে মারাত্মক বলটা আমি পাঠাই, এটা ও আর ফেরত পাঠাতে পারে না। হার স্বীকার করে সাময়িক। এভাবেই চলছে। বলা যায় ওই জিদই আমাকে নিয়ে যায়। মৃত্যুর মুঠোর ভেতর জীবনের গরম নিঃশ্বাস ছুঁয়ে আমি বাঁচি। স্বীকার করাই ভালো আর-ও কয়েকবছর আমার এই পৃথিবীতে থাকবার লোভ, ইচ্ছা ও তাগিদ আছে। জীবন আমাকে কী দিলো তা নিয়ে বেশি ভাবি না। বরং দুহাতের অঞ্জলিতে

আমার বাগানের ফুল নিয়ে ওর জন্য দাঁড়াই। স্বপ্ন ছাড়া যে কোনো বেঁচে থাকাই নিরর্থক, তাই চেষ্টা করি সবকিছুর মধ্যে স্বপ্নগুলো যেন বাঁচে। ফিসফিস করে তাই নিজেকে শোনাই ঃ

আক্রান্ত হবার জন্য একটা গোটা দিন পড়ে আছে।
এখন সবে ভোর, তুই আমাকে
তোর দু'একটা স্বপ্নের কথা বল।

দুই

বাঁকের মুখে পৌঁছেছি।
চেনা কাউকে খুঁজছি।

প্রত্যেকটা বাঁকের মুখে
অজস্র অচেনা মুখ
অভ্যর্থনার হাত বাড়ায়।
কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে আমি দেখি ঃ
আরো দু'চারটে চেনা মুখ কমে গেছে।
অল্প দুচার ন, যারা এখনও আমার
পায়ে বেঁধা কাঁটা,
মুখে লাগা আগুনের হলকা,
বুকে রক্ত-ঝরানো বিষাদের তীরে ব্যথা পায়,
ডেকে নীচু স্বগত গলায় বলি তাদের ঃ
বাঁক পেরিয়ে বাঁক পেরিয়ে বাঁক পেরিয়ে
চললুম হে ॥

হ্যাঁ, আমি চললুম। এভাবেই। এই উনিশশো সাতাশির জুনে এসে লক্ষ্য করছি আমি আরো একটু বেশী একা হয়ে পড়েছি। বন্ধুরা আর ততটা বন্ধু নেই। বলা যায় ওদের সম্পর্কে আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। আর এর পাশাপাশি রয়েছে পুরনো সম্পর্কগুলির (দু-একটি ছাড়া) সঙ্গে তুমুল বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য আমিই দায়ী। ওদের আকাশ থেকে আমার ঘুড়ি আমি নিজেই নামিয়েছি। লাটাইয়ে সুতো গোটানোর ভঙ্গিতে গুটিয়ে এনেছি নিজেকে। ফলে এবারের যাত্রায় পথিক হিসেবে আমি একেবারে একা।

কিন্তু নিঃসঙ্গতাকে আমি আর ভয় পাই না। বরং বলি গত দশবছরে এত তুমুল লড়াই লড়েছি ওর সঙ্গে, যে ওর জমির অনেকটাই দখলে চলে এসেছে আমার। এখন সেই দখলীকৃত জমিতেই আমার ভাবনাগুলো বীজ বোনে, ফসল ফলায়, গোলা ভরে সম্বৎসরের ধান ওঠে। আমার ক্ষুধিত সত্তার দুবেলা দুমুঠো জোটে। ফলে যাবার সময় যন্ত্রণাগুলো এখন হাতের মুঠোয় সেই চাবি দিয়ে যায়, যা দিয়ে দরজা খোলা যায় যে কোনো অভিজ্ঞতার। ছন্দ লয় তাল বুঝে ছান্দসিক পা প্রায় প্রতিবারই এখন যন্ত্রণায় ঠিকঠাক পড়ে, বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়।

তিন

এবার প্রাসঙ্গিক হই। যে কথা লেখার জন্য এই লেখার অবতারণা, সেই কথাই বলি। নতুন এই বাঁকের মুখে লক্ষ্য করছি আমার উচ্চারণে আবার একটা বদল ঘটেছে। এবার তাতে অন্তর্মুখিনতা স্পষ্ট। সে এবার সদর থেকে অন্দরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কবিতা দুধরনের। প্রথমটা হল সমস্তকিছুর ভেতর নিজেকে নিয়ে যাওয়া, আর দ্বিতীয়টা হল নিজের ভেতর সমস্তকিছুকে নিয়ে আসা। প্রথম পথে যাত্রা শুরু, বেশ কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছিল পা চলে যাচ্ছে দ্বিতীয় পথে। এবার যেন সত্যিই এসে পড়েছি সেখানে। প্রত্যেকটা লেখার ভেতর আমি এবার নিজেকে নিয়ে আসতে পারছি। যেন খাপে মাপসই তরবারি, লেখাগুলোর ভেতর এভাবে চলে আসছি। লেখা কম হচ্ছে। মাসে চারটে কি পাঁচটা। কিন্তু একেকটা লেখা যখন শেষ হচ্ছে বা আসছে, যেন, টলিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কেঁপে উঠছি আমূল। মনে হচ্ছে ভেঙেচুরে ধুলোয় ধুলো হয়ে যাবো। তুলি বহুবার রঙের বাটিতে না ডুবিয়ে ভুল করে রঙে ডুবিয়ে ফেলছি। ফলে তোলপাড় বুক থথর হাঁটু, পিঠ বেঁকে যাচ্ছে ছবিগুলো শেষ করতে করতে। কিন্তু আমিও না-ছোড়। ছবি শেষ করে তবে হাসি ফুটছে ঠোঁটে।

চার

এর পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। যা আগে ছিল না, এখন তাই দেখছি। টের পাচ্ছি। সমস্ত ছাপিয়ে, যন্ত্রণা ক্লেশ বিরহ দুঃখ ছাপিয়ে একটা লিরিক্যাল মেজাজ যেন ফুটে উঠছে আমার লেখায়।

হেসাডির জঙ্গলে ঘুরে আসার পর এই বদল শুরু। এখনও তার জের চলছে। কোজাগরীর রাতে হেসাডির বনবাংলো থেকে রাত দশটায় বেরিয়ে মাইল তিনেক রাস্তা পায়ে হেঁটে হিরনি জলপ্রপাত। এই যাওয়াটা আমাকে বদলে দিল। গোটা রাস্তাটা কেমন আচ্ছন্ন ছিলুম। দুই সঙ্গীকে দুপাশে রেখে কবিতা বলতে বলতে গেছি। দুপাশে স্তব্ধ, চন্দ্রাহত জঙ্গল। মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদের ফোয়ারা। এমন রাত আমার জীবনে প্রথম। কী বলবো, আমি একেবারে পাগল, মাতোয়ারা। পুরনো জীবনটা যেন একপলকে মিথ্যে হয়ে গেছে স্মৃতিতে। মনে হচ্ছে আমি সেইমুহূর্তে সবেমাত্র শুরু হয়েছি। স্রেফ ওই মুহূর্তের জন্য। জীবনে সেই প্রথম আমার সুন্দরকে চাক্ষুস দেখা। ছোঁয়া। কদিন আগে জানলার কাছে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ডুবে গেলুম সেই রাত্তিরের ভেতর। মন্ত্রমুগ্ধের মত কাগজ-কলম টেনে নিয়েছি। লেখাটা যখন শেষ হল :

গেলাস উপুচে গেছে ; অত সুধা ঢেলো না হে চাঁদ।

সংসারে সন্ন্যাসী থাকি, উদাসীন, ভীড়ভর্তি একা।
জঠরে আগুন, তবু যে-দুই কম্পমান হাতে
আনন্দের মন্দিরা বাজাই, সেই হাতে ধরেছি গেলাস।
হেলেঞ্চা কলমীর স্বাদে তৃপ্ত-থাকা ঠোঁট
তোমার সুধায় যদি মজে গিয়ে মুহ্যমান হয়,
ঘরে ফেরা হবে তো আবার ?
নাকি এই বিদেশ বিভুঁয়ে একা চন্দ্রাহত মরে
থেকে যাবো জ্যোৎস্নার শহিদ !

গেলাস উপুচে গেছে ; অত সুধা ঢেলো না হে চাঁদ।
বরং আমাকে রাখো ভৃত্য, ক্রীতদাস।
যন্ত্রণার আবেগের আগুনের ফাগুনের প্রত্যেক কথাকে
মন্দিরায় নিতে নিতে বলে যাবো :
তুমি ছিলে, সব ক্লান্ত পিপাসার পাশে
আছো, আজো, সুধা হয়ে গেলাসে গেলাস ॥

এই আমার বদল। 'ভীড়ভর্তি একা' শব্দদুটোকে পাশাপাশি এনে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। মনে হল এই লেখাটা আমার অন্যসব লেখা থেকে আলাদা। কী বলবো, লেখাটার প্রেমে পড়ে গেলুম। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে মনে আওড়াই। ভেবেছিলুম এই লেখাটার টানে টানে আরও কয়েকটা হবে। কিন্তু না, তা হলো না। ও কি তবে স্রেফ একা এসেছে ? মনখারাপ হয়ে গেল। অধরা মাধুরী ছন্দবন্ধনে ধরা দিল মাত্র ওই একপলকের জন্য ? তীব্র মনখারাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াই। অস্থির। বিমর্ষ। ম্লান। হঠাৎ একদিন দ্বিতীয় আক্রমণ এল। টলে উঠলুম। পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নেবার মুহূর্তে আনন্দে টলমল করে উঠলুম এই ভেবে যে, প্রথম লেখাটা তবে একা আসেনি। ওর ঝোলায় আমার জন্য আরও কিছু আছে। মনখারাপ সেরে গেল। খুলে বলি ঘটনাটা। বাবার খুব অসুখ গেল। সঙ্গে তীব্র অর্থকষ্ট। তীব্র অনিশ্চয়তায় দোল খাওয়া কয়েকটা দিন। উদ্‌ভ্রান্ত। বিপর্যস্ত। আমার এক স্নেহভাজন ছাত্র ও একবন্ধু সেই দুর্যোগে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে। ছাত্রটির কদিন বাদেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ওকে বললুম, তুমি বরং না-ই থাকলে সঙ্গে, ফেরো। শুনে বন্ধু বলল, না থাক্। ওর কমবয়স, সামনে পরীক্ষা, তবু থাক। জীবনে সবরকম অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। এতে ও শক্ত হবে। স্রেফ কথার কথা। বন্ধু অত ভেবে বলেনি। বিশাল কোনো মাছ ঘাই দিলে জলে যেমন তোলপাড়, আমার ভেতর হঠাৎ ঘাই দিয়ে তুমুল তোলপাড় তুলল এই লাইনটা : যন্ত্রণায় পা, বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়। 'যন্ত্রণায় পা' আমার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু 'বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়' একেবারে অপ্রত্যাশিত। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ডাক্তার, ওষুধ, ই সি জি রিপোর্ট. এসব করতে করতে আমি তখন একটু একটু ক'রে ডুবে পড়েছি লেখাটায়। বলা যায় ওর বঁড়শির টোপ আমি গিলেছি। ফলে ও তখন আমাকে টানছে। জল তোলপাড়। একটু একটু করে মাছ ডাঙার দিকে আসছে। দিন দশেক পরে যখন পুরো শরীর নিয়ে উঠে এল, আমি ওকে দেখলুম। লেজের ঝাপ্টায় ও আমাকে ওর পাশে শুইয়ে বলল, বড্ড ক্লান্ত তুমি, একটু জিরোও। আমি তাই করলুম। একহাতের ব্যবধানে শুয়ে খুঁটিয়ে দেখলুম ওকে :

যন্ত্রণায় পা, বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়।

টিকে থাকার এই লাভ এতটা দেখা হল।
স্রেফ টিকে ছিলাম বলে আমি অনেক দুঃখকে
গোখরোর ফণা থেকে নর্তকীর ঘুঙুরে নামতে দেখেছি।
মরিয়া ডুব দিয়ে বিষাদের কচুরিপানার নীচে
পেয়েছি টলটলে জল স্নানের।
পায়ে কাঁটা, বুকে পাথরচাপা দিনগুলোর
সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখেছি :
মরা মরা করতে করতে কিভাবে তারা
নির্ভয় নিশ্চিন্ত শেষমেষ রামনামে পৌঁছয়।

টিকে থাকাই বেঁচে থাকা কিনা জানি না,
কিন্তু জানি যে কোনো ভাবেই হোক টিকে গেলে
ছন্দ লয় তাল বুঝে ছান্দসিক পা
যন্ত্রণায় ঠিকঠাক পড়ে, বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়॥

'গাজনের মেলা' এবং 'জীবন দেখায়'- এর পর

ব্রত চক্রবর্তীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ

'আগুনের মাঝখানে'

প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশক : শতভিষা

কবিতার ওপিঠ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

যে কোনো কিছু নিয়েই তো কবিতা লেখা হতে পারে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকে যা ঘটে তার ধারণাচিত্রটিকে মানসচিত্রে উপনীত করতে গেলে তাকে একটা চারিত্রিক সত্যে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক যোগবিয়োগ অথবা কাটাকুটি চলতেই থাকে। এই যোগবিয়োগ অথবা কাটাকুটি সবসময়ই যে কাগজে-কলমে হতে হবে তাও নয়। তৃতীয় চোখটির সামনেও পছন্দ অপছন্দের পরস্পরচ্ছেদী বৃত্তবন্ধন কখনো বা দ্রুততালে, আবার কখনো বিলম্বিত লয়ে ঘটে যায়।

একটা সময় আসে যখন হঠাৎ-ই বস্তুভাবের সঙ্গে ব্যক্তিমনোভাবের অন্বয় হয়; দৃশ্যের সঙ্গে অদৃশ্য অনুকল্পনার গাঁটছড়াটি বাঁধা হয়ে যায় অন্তর্লীন হয়ে। অভিজ্ঞতাটুকু সবসময় যে আপ্লুত করে এমন নয়; স্নিগ্ধ, ঝিরঝিরে আত্মতৃপ্তির জায়গায় এমন অনুভূতিও হয় যা আপন মনে চলতে চলতে হঠাৎ হোঁচট খাওয়ার মতো। অথবা অস্তিত্বে এক বিরাট ঝাঁকুনি লেগে চিরাচরিত পরিবেশ থেকে দূরত্বে বা নিঃসঙ্গতায় পৌঁছে যাওয়ার মতোই। এবং এ পর্যন্ত এসেও ব্যাপারটা আকস্মিকতার পর্যায়েই থেকে যায়।

আবার, সমস্ত ব্যাপারটা যে শুধু সময়সাপেক্ষ তাও নয়, কণ্টকরও বটে। যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা সকলেই জানেন, কী সাংঘাতিক সতর্ক থাকতে হয় কবিকে এসময়টায়। কবিতা তো শব্দেরই খেলা, শব্দকে গদ্যের সাংবাদিক বাস্তবতা থেকে অনুভবের স্পন্দনে মুক্তি দেওয়াই তো কবিতা। কিন্তু আগাগোড়া সে শৃঙ্খলার টানে একে বেঁধে রাখতে হয় তাতে করে শেষ পর্যন্ত স্নায়ু টনটনে হয়ে যায়। একই শব্দ ক্ষেত্রবিশেষে ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে ভেল্কি দেখায়। কোনো শব্দ অগ্নিগর্ভ, কোনোটি বা তেজা বারুদ। সুতরাং তারা কবিকে সবসময়ই কমবেশি অস্থির তো করেই, অসুস্থ করে তোলাও বিচিত্র নয়। তাই কবি দূরত্ব বা নিঃসঙ্গতায় এসে যতটা সুখী, অসুখীও ততটাই।

জানি কোনো উপমাই মুখসই হবে না। তবু আমার বক্তব্যকে যথাসাধ্য পরিষ্কার করতে উর্ণনাভের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করছি। নিজের নাভি থেকে উৎসারিত উর্ণরেখাটিকে সে যতবারই কোনো এক জায়গায় গেঁথে দিতে চায়, ব্যর্থ হয় সে ততবারই। তারপর নির্দিষ্ট জায়গাটি আয়ত্তে আনতে পারলে চলে তার জাল বোনার কাজ। মহূর্তের জন্যেও তার মনঃসংযোগ সে ব্যাহত হতে দেয় না। মানুষের মনও একইভাবে ভাব আর কল্পনার সূত্র গড়তে থাকে যতক্ষণ না তার বোধি সক্রিয় হয়।

যে কোনো কবিতাই বিশেষ এক ভাব কল্পনাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশের প্রবল কৌতূহল বা আকুল আগ্রহেরই ফল। এই আত্মপ্রকাশ তাৎক্ষণিক তো নয়ই, ত্বরান্বিতও করা যায় না। একই প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে উঠে আসা অনুচিত্র বা উপচিত্র—যা বিভিন্ন বস্তুর তল্লিষ্ট অবলোকনের পরিণাম—যতক্ষণ না বোধিতে কেলাসিত হয়ে ওঠে, কবিতার আবির্ভাব হয় না।

কবিতা লেখার সময় এমন ব্যাপারও ঘটে যার ফলে কবির বিস্ময় এবং আনন্দ কীট্‌স বর্ণিত জ্যোতির্বিদের নতুন জ্যোতিষ্ক প্রত্যক্ষ করা অথবা নাবিক কলেজের দারিয়েন পর্বতশীর্ষ থেকে প্রশান্ত মহাসাগর দেখার বিস্ময় এবং আনন্দের চেয়ে কম নয়। একধরনের আবিষ্কারের আনন্দ যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরাই শুধু জানেন, কারণ ব্যাপারটা ঘটে পাঠক এবং সমালোচকের ধারণার বাইরে। আর এ জিনিশ গোটা কবিতাটি দানা বেঁধে ওঠার দীর্ঘসময়ের মধ্যে ঘটলেও, কয়েকটি মুহূর্তেরই।

কবিতা শব্দের খেলা নিশ্চয়ই, কিন্তু খেলা কীভাবে খেলতে হবে তা তো আগে থেকেই ঠিক করা থাকে না। তাই কবিতা লেখা যখন শেষ হয় কবিমাত্রেরই বিস্ময় নিশ্চয়ই জাগে। টুকরো টুকরো শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প অথবা বাক্‌প্রতিমাগুলিকে যদি জুড়ে দিলেই কবিতা হত তবে এই বিস্ময়ের সৃষ্টি হত না। দীর্ঘ সময়ও লাগত না। কিন্তু কবিতা তো তা নয়। শব্দের পবিত্রতাই তো কবিতার সঞ্জীবনী শক্তি। চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও তা যেন বার বার এড়িয়ে যায়। ধরা দিয়েও ধরা দেয় না। এবং ধরা দিলেই কবিতা পূর্ণাবয়ব পায়। তখন অবাক হয়ে নিজের লেখার দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। ভাবনা হয় কোথায় ছিল এইসব। এমনসব শব্দ বা শব্দবন্ধ বেরিয়ে আসে যা ভাবিনি, অথবা, ভেবেছিলাম হয়তো স্বপ্নের অতিনম্বর নৈরাজ্যে।

কবিতার ধারণা মোটামুটি একটা চেহারা পেলে গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে কবিকে মোহমুক্ত হতেই হয়। তিনি তো রক্তমাংসেরই মানুষ; মত যুক্তিবাদীই হন না কেন ভাবাবেগ তাকে আক্রান্ত করেই। তাই যতক্ষণ না তাঁর রচনা এক নিটোল ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে তিনি শব্দকে ভেঙেচুরে, দুমড়ে, মুচড়ে, সবরকমের বাহুল্য বর্জন করতে করতে কবিতার দিকে এগিয়ে যান। কবিতাও এগিয়ে আসে তাঁর দিকে।

এত কথা বলার পর উদ্ধৃত করছি নিজেরই একটি কবিতা। নিজের সম্বন্ধে কিছু বলার মতো আহাম্মকি বোধ হয় আর নেই। লজ্জা, সঙ্কোচের কথা না হয় না-ই বললাম। তাছাড়া কবিতা লিখি, দুচারজন ভালোমন্দ বলেন, দুএকজন সহৃদয় সম্পাদক ছাপেনও। কিন্তু তাতে কবিতার নেপথ্যকাহিনী ধরা পড়ে না। তাই, কিছুটা বাধ্য হয়েই, বলছি নিজের কথা। বিচারের জন্যে তুলে নিচ্ছি আমার এই কবিতাটিকে—পুরোপুরিই।

সজ্ঞানেই কর্মকাণ্ড শেষ করতে চাই
অথচ আমার ঝোলা দীর্ঘশ্বাসে ফুলে উঠলে মনে হয় আমি
আজীবন অপ্রস্তুত ছিলাম।
তবু কোনো অন্ধকার দূরের মৃত্তিকা থেকে অবেলার বৃষ্টির মতন
দুঃখের পল্লিগ্রাম পার হয়ে এলে
চিবুক ঘনিষ্ঠ করা নীল অত্যাচারগুলি স্মৃতিময় হলে
পাথর কুড়োই;
ভালোবাসা অসন্তুষ, তবু
অনুজপ্রতিম রোদ সূর্যাস্ত ঘেরাও করে আমাকে সাহস এনে দেয়।

অস্পষ্ট ছায়ার মতো চিড়খাওয়া কাঁচে
লণ্ঠনের আলো ফেলে কারা
আমাকে দেখায় যেন যত কিছু ভুলচুক, ভুল বোঝাবুঝি।
আমি দোষী নই
অন্যথায় দুঃখ হত পরিত্যাজ্য ফেঁসে যাওয়া জঘন্য কাপড়
নিজের অজ্ঞাতসারে দোষী হলে বিস্মরণ অনায়াস হত।

শরীর বিচ্ছিন্ন করে হেঁটে যাই তবুও ভাসান ……
অনুজপ্রতিম রোদ সূর্যাস্ত ঘেরাও করে স্মৃতিময় হলে
সবকটা চারাগাছে অবিনাশী শিথিলতা আনে।

সজ্ঞানেই কাজকর্ম শেষ করতে চাই।
তবু যদি ভেঙে যায় প্লাবনবিধৌত থালিয়াড়ি
মনে হয় আজীবন অপ্রস্তুত ছিলাম।
সূর্যাস্ত জলের ধ্বনি ঝরে পড়লে বুকের তিমিরে
নীল অত্যাচারে মাতে ঘনিষ্ঠ চিবুক
ঘরবার অন্ধকার করে
আকাশের রঙ্গমঞ্চে ট্র্যাজিডির মতো চাঁদ বাজিমাৎ করে।

একজন সামাজিক মানুষ দায়িত্ব-সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যর্থতা আসে। আর তখন তার দ্বিধা এবং অসহায় অবস্থার একটা ইঙ্গিত কবিতাটির প্রথম তিনটি পংক্তিতে আছে—বেশ খোলাখুলি। কিন্তু আলাদা করে নিলে শব্দগুলোয় কবিতার ভাগটা কম। অথচ ঐ ভাব নিয়েই আমি কবিতাটি লিখতে বসেছিলাম। আর পংক্তিগুলোও ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এসেও গিয়েছিল। আবার দূরের মৃত্তিকা থেকে অবেলার বৃষ্টির মতন অন্ধকারের দুঃখের পল্লিগ্রাম পার হয়ে আসা, চিবুক ঘনিষ্ঠ করা নীল অত্যাচারগুলির শ্রুতিময় হওয়া ইত্যাদি শুধুমাত্র কবিতা-আক্রান্তই নয়, প্রারম্ভিক পংক্তি-গুলোকেও ছুঁয়েছে। ফলে, সমস্তটার মধ্যে একধরনের গতিশীলতা এনেছে। তারই টানে এসে গিয়েছে পরবর্তী অনুক্ত কথাগুলিও। ফলে ভাব এবং ভাবনা গোল হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেই কাঙ্খিত ফর্ম বা আঙ্গিকের যা কবিতার নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।

কবিতাটি শেষ মোচড়ের দিকে যাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত পরিশ্রম বা অনুশীলনের ছাপ ফুটে উঠেছে পাথর কুড়োনো, অনুজপ্রতিম রোদের সূর্যাস্ত ঘেরাও করা, লণ্ঠনের আলো ফেলে ভুলচুক দেখানো, শরীর বিচ্ছিন্ন করে হাঁটা ইত্যাদি বাক্যাংশ বা উপমার মধ্য দিয়ে। সাবলীলভাবে এরা আসে নি। হঠাৎ তো নয়-ই। একই অনুষঙ্গে তৈরি হয়েছে হয়তো, কিন্তু ঠিক কোলাজের মতো পরপর বা পাশাপাশি সাজানো নয়। কাট ছাঁট আগে ভাগেই শেষ করা হয় নি। সাজানোর কোনো নির্দিষ্ট ফরমুলাও ছিল না। অবশ্যই সতর্ক থাকতে হয়েছে, বিশেষ করে গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে। সময় লেগেছে

অনেকটা। তবু, মোটামুটি একটা ভাবচিত্র দাঁড়িয়ে গেলেও, ঠিক দানা বেঁধে ওঠে নি। তাই কাটাছেঁড়া শুধু আগেই নয়, পরেও করতে হয়েছে।

শেষের স্তবকটি কিছুটা পুনরাবৃত্তিমূলক। তবু, একেবারে শেষ পংক্তিতে 'ট্র্যাজিডির মতো চাঁদ বাজিমাৎ করে' লিখেই চমকে উঠেছিলাম। লেখার পর মনে হয়েছে, আজও যখন কবিতাটি পড়ি মনে হয়, কোথায় ছিল ঐ বাক্যাংশটি যা কোনো কিছু ভাববার, বুঝবার, জানবার সুযোগ না দিয়েই কলমের ডগা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। যা এখন সমগ্র কবিতাটির শেষে কাজ করছে 'পারগেইশন্'-এর মতো। কবিতা কবিতা হয়েছে কিনা যাঁরা বিচারক বলবেন। আমি শুধু বলছি ব্যাপারটা হঠাৎ নয়।

তবু হঠাৎ কবিতা কি লেখা হয় না? হয়। স্মর্তব্য, লেখাটি যত হঠাৎ-ই হোক না কেন কবির অজ্ঞাতে অথবা জ্ঞাতসারে তার প্রস্তুতি চলতে চারপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সময়। ধাক্কা খেয়ে আমরা কখনো নড়ছি। আবার কখনো বা মাথার ওপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে স্রোত। আমরা থাকছি অনড় নুড়ি হয়ে। ঠুনকো দিনযাপন আর দুঃসহ পারিপার্শ্বিক চিন্তায় অনুচিন্তায় মন ভরে দিচ্ছে। সবকিছুর স্রোতে হিমবাহের মতো সে মনের অনেকটাই ডুবে থাকছে। যেটুকু আবেগ হঠাৎ-ই উচ্ছ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সময় এবং পরিবেশের মেলবন্ধনে তার থেকে তাৎক্ষণিক সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে। আর সেইভাবেই হয়েছে বলে কবিতাটি কেমন করে দানা বেঁধেছিল কাটাছেঁড়া করে দেখিনি।

তাৎক্ষণিকই হোক, অথবা বিলম্বিতই হোক, কোনো কিছুই তো ডুঁইফোঁড় নয়। এবং, কবিতায় ম্যাজিক থাকলেও ম্যাজিক দিয়ে কবিতা হয় না। তার জন্যে চাই অনুশীলন আর তারই স্বভাবে গড়ে ওঠা মনন। এবং, ব্যক্তিগত কৌতূহল বা অনুসন্ধান মিটে গেলে দরকার সমগ্র ভাবনাটিকে ঘষে মেজে স্পষ্ট অবয়ব দেওয়ার মতো নির্দিষ্ট সময়।

শিয়াখালার বনমালী

□ গল্প

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইঞ্জেকশন রেডি করার সময় নার্স মালতী দেখল বনমালী আড় চোখে দেখছে। ফতুয়ার হাতা সরিয়ে শীর্ণ বাহুতে ছুঁচ ফোটানোর আগেই সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

বললাম যে আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ো না।

ডাক্তারবাবুকে বললে পারতেন। উনি লিখে দিয়ে গেছেন। আমাকে ওঁর কথামতো চলতে হবে। নিন, দেরি করবেন না। ওষুধটা জমে যেতে পারে।

আমি তো ডাক্তারকে বলেছি, যত খুশি ওষুধ দাও। কিন্তু শরীরে ছুঁচ ফোটানো চলবে না। উনি তো ট্যাবলেট খেতে বলে গেছেন।

রোগীদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে ডাক্তারদের ওরকম বলতে হয়।

মালতী প্রায় জোর করেই ছুঁচ ফুটিয়ে দিল বনমালীর হাতে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ল, তবে বনমালী নড়াচড়া করেনি। নড়লে ছুঁচ ভেঙে যেতে পারে। ভাঙা ছুঁচের টুকরো শরীর থেকে বের করতে তখন আবার কাটাছেঁড়ার দরকার হতে পারে। কয়েক সেকেণ্ড সে চোখ বুজে শুয়ে থাকল।

ইঞ্জেকশন দিয়ে মালতী যখন ফিরে যাচ্ছে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল বনমালী।

শোনো, এরপর আর আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে এসো না। যদি জোরজার করো বাড়ি ফিরে যাবো।

বললাম তো আমার করার কিছু নেই। ডাক্তারবাবু লিখে দিয়ে গেছেন।

রাখো। ওসব লেখাজোখা অনেক দেখেছি।

মালতী মেয়েটি নরম। ট্রেনিং শেষ করে সবে পুরোদস্তর নার্স হয়েছে। এখনও রোগীদের সঙ্গে হেসে কথা বলে। দুধরনের রোগী আছে। একদল বাধ্য। তারা চুপচাপ শুয়ে থাকে, ওষুধ খায়, দরকার হলে ইঞ্জেকশন নেয়। আর একদল কথা শোনে না, অবাধ্য। রোগ হলে অস্থির হয়ে ওঠে। অল্পেই কাতর হয়ে পড়ে, ছটফট করে। ধৈর্য বলে কিছু নেই তাদের। এই দুধরনের রোগীদের সঙ্গেই মালতী এখনও পর্যন্ত ভালোই ব্যবহার করে। ওষুধ খেতে না চাইলে কাউকে ধমক দেয় না। ইঞ্জেকশনও দেয় বুঝিয়েসুজিয়ে।

মালতী হেসে বলল—আচ্ছা, বিশ্বাস না হয় এনে দেখাচ্ছি ডাক্তারবাবু কী লিখে দিয়ে গেছেন।

প্রেসক্রিপশন এনে অবশ্য লাভ হ'ত না। বনমালী পড়তে জানে না। বয়স প্রায় ষাট। এতদিন যখন লেখাপড়া না জেনেই দিব্যি চলে গেছে, তখন আর অসুবিধে কি? বাকি জীবনও অনায়াসে কেটে যাবে। শিয়াখালার বেগুনচাষী বনমালী। তার মতো চাষীরা লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন বোধ করে না। মাটির ভাষা তারা পড়তে জানে, এটাই তাদের বড় শিক্ষা।

বস্তুত বেগুনচাষী হিসেবে বনমালীর নামডাক যথেষ্টই। রানাঘাট-বানপুর লাইনে ওপার বাংলার সীমান্ত বরাবর ছোট্ট গ্রাম শিয়াখালা। খানযাটেক হোগলার ঘর নিয়ে এই গ্রাম। যাদের অবস্থা একটু ভালো তাদের বাড়ির ছাদে টালি উঠেছে। বাকি সব খড়ে-ছাওয়া। মাটির দেয়াল একেবারেই দেখা যায় না। পাঁচিল ঘেরা বাড়ি নেই। সব রাওতিতের বেড়া। দেশ-ভাগের পর ওপারের কিছু লোক এখানে এসে বসবাস শুরু করেছে। না'হলে বাংলার মানচিত্রে এই শিয়াখালা গ্রামের কোনও অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহ। এখন না হয় গ্রামটাকে ছোট বলে বর্ণনা করা যায়। আগে কি বলা হ'ত? পাড়া বললেও হয়ত কিছু বোঝানো যেত না।

এই গ্রামেই বাসা বেধেছে বনমালী। ছেলে মেয়ে নেই। বাড়িতে আহার যোগানোর লোক বলতে সে আর তার বউ। লোকে বলে বুড়ো বুড়ী। তা, দেখতে দেখতে এই গ্রামেই পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেল বনমালীর। গ্রামের বাচ্চাগুলোও চোখের সামনে জোয়ান হয়ে উঠল। তারাই বনমালীকে বলে বুড়ো—বুড়ো বেগুন।

দশ কাঠা জমিতে সারা বছরই সে কিছু না কিছু বেগুন ফলায়। এক একটা বেগুনের ওজন হয় এক, দেড় কেজি। কালো কুচকুচে বেগুন, কাঁটা বেগুন। গোলগাল বেলুনের মতো এক একটার চেহারা। ভিতরটা নরম, চাপড় দিলেই বোঝা যায়। অথচ ছেলেছোকরারা বলে রেগুন বুড়ো।

সারা নদীয়া জেলার বেগুনচাষীদের মধ্যে একবার প্রথম হয়েছিল বনমালী। কৃষ্ণনগরের প্রদর্শনীতে ওর একটা দু কেজি ওজনের বেগুন প্রথম প্রাইজ পেয়েছিল। কলকাতা থেকে টেলিভিশনের লোকেরা ওর ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সেবার টেলিভিশনের কৃষিকথায় ওর ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়। তরুণ প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করেছিল—কী সার দিয়েছেন?

মনে নেই।

সুফলা?

বিনি সারেই তো আমার বেগুন গা-গতরে বেড়ে ওঠে। গোবর দিলে ভালো।

কতটা দিয়েছেন?

এই এতটা।

দু হাত মুঠো করে সে দেখায়।

টেলিভিশনের সেই ক্লোজ-আপ শিয়াখালার লোকেরা দেখেনি। শুনেছে। কাজের কাজ হয়েছে একটাই। গ্রামে তার কিছু মানমর্যাদা বেড়েছে। গ্রামের জোয়ানরাও বলেছে, দেশে এত তো ধানচাষী, পাটচাষী। পারলে তারা টেলিভিশনে ছবি ওঠাতে?

এই ছেলেরাই কলকাতার হাসপাতালে এনে ভর্তি করে দিয়েছে বনমালীকে। বগুলায় একটা হেলথ সেন্টার আছে। বনমালী সেখানে যেতে চায়নি।

ওখানের ডাক্তার ভালো, নার্স ভালো। কিন্তু হাসপাতালের বাড়িটাই যত গোলমেলে।

জ্বরের ঘোরেও কথাটা জানাতে ভোলেনি বনমালী। বড্ড গরম ওই হাসপাতালে। আমাকে নিয়ে যাস না।

হাসপাতালের এ্যাসবেসটস ছাদের কথাই সে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বগুলার হাটে বেগুন বিক্রি করতে গিয়ে সে বছরের পর বছর দেখেছে, রোগীরা

গরমে বেগুনপোড়ার মতো ঝলসে যাচ্ছে। বোশেখ মাসে সে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হল। এটা এমন এক হাসপাতাল যেখানে ছাত্ররা হাতে কলমে ডাক্তারি শেখে।

কী শিখছে ওরা? বলি সত্যিকারের ডাক্তারি কিছু শিখছে? ডাক্তারের চোখটাই আসল। বগুলার হরেন ডাক্তারকে দেখতাম রোগীর কাশির আওয়াজ শুনে রোগ বলে দিত। হরেন ডাক্তার বেঁচে থাকলে কি আর আমার এত কষ্ট হ'ত?

মালতীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে বনমালীর। অন্তত এই একটি নার্স যে তার কথা মন দিয়ে শোনে। সময় দেয়।

মালতীই বলেছিল—বুকের ব্যথাটা ভালো নয়। জ্বর তো সারল। এখন আসল চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

বুকের ব্যথা কার নেই বলো? আর তোমার এই হাসপাতালে না এলে এত রোগ যে আছে তা তো জানতামই না। রোগ নিয়েই মানুষ দিব্বি বেঁচে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, গায়েগতরে খেটে কাজ করছে।

বনমালীর কথার উত্তরে মালতী বলেছিল—রোগ পুষে রাখতে নেই। খুব খারাপ।

রোগ ভালো হয়ে গেলেই হয়ত মানুষ বাঁচবে না। বেঁচে থাকাও তো একটা রোগ। বেঁচে থাকার জন্যে একটা রোগ দরকার।

মালতী জানে, বনমালীর ই সি জি রিপোর্টে কী মারাত্মক রোগই না ধরা পড়েছে। যে কোনও মুহূর্তেই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

না না, আপনি তো ভালোই আছেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে নিন। বাড়ির জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

লোকে তো কত কিছু নিয়ে থাকে। আমি আমার রোগটাকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসি। রোগটাকেই ভালোবাসি। এই যে আঁচিলটা দেখছো, এই যে, এই যে—দেখো—

বনমালী বাঁ হাতের কনুই দেখিয়ে বলল—লোকেরা কতবার বলল কেটে নাও, কেটে নাও। আমি শুনছিনা। কোনও তো কষ্ট দিচ্ছে না আমাকে, তাহলে অহেতুক কাটাকুটি করতে যাই কেন?

ডাক্তারবাবু ডাকলেন মালতীকে। হার্ট স্পেশালিস্ট। নিজের হৃদয়টিও দুর্বল করে বসে আছেন।

এতক্ষণ কী বকবক করছিলে?

আমি শুনছিলাম। যে কোনও সময়েই ওঁর কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন আর শোনা হ'ত না।

এমন কী মূল্যবান কথা? জানো তো হার্ট পেশেন্টদের বেশি বকাতে নেই।

ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকাল মালতী। কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। আস্তে আস্তে ফিরে গেল বনমালীর বিছানার কাছে।

বনমালীর এখনও অনেক কথা বলার আছে। মালতী শুনবে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবিতার বই

আপেল কিম্বা ধ্বংসস্তূপ (আনন্দ)

হেমন্তের বিষ (আত্মপ্রকাশ)

প্রবন্ধ

বীরভূমের যমপট ও পটুয়া (সুবর্ণরেখা)

চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর (আনন্দ)

ভাসা / সুনীলকুমার নন্দী

লোকালয় দূরে রেখে কখন এসেছো? এলে
এই অবেলায়, এই মেঘছেঁড়া জ্যোৎস্নায় ভিজে অন্ধকারে
বুকে পেতে চাও সেই
আকাশ-পৃথিবীমেশা চুম্বিত রেখায় উদ্দাম জলরাশি? জলস্রোতে
ভেসে চলা
রক্তের গোপন চাপ খুলে-খুলে জলে—

এখন হবে না ভাসা, এ নয় সন্ন্যাস; দেখো, জলে
জোয়ার লাগে না, ধু-ধু বালির চড়ায়
নৌকো
অলসের মতো শুয়ে-শুয়ে
শরীরে ছুটন্ত বেগ, বাইচের টান হয়তো ভুলে গেছে কবে।

দাঁড়িয়ে রয়েছি দাও / রাত্রি ভট্টাচার্য

যেখানে হাত পেতে আমি দাঁড়িয়েছি
মিশে আছে সেখানে এখন সুধা বিষ—
বড় বেশি মিশে যাচ্ছে, মিশে যায়
ভেদরেখা
কিছুতে পৃথক করে নেওয়া যায় না যেন, তবে
কী নেব কী নেব।

তবুও আমি তো জানি,
ঠেলে রেখে বিষ
নিজ্জিধায় সুধা নেওয়া যায় না, যায় না পাওয়া
বুকে তুলতে
এমন কি শুধুমাত্র বিষ; আমি
হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দাও
অবিমিশ্র সুধা কিংবা বিষ।

সালিম আলি / তারাপদ রায়

আমিও তো পাখি ভালোবাসি।
আমিও যে শালিক পাখিকে ডেকে বলি,
'শীত শেষ, এবার যে যার বাসা খুঁজে পেতে নাও,
ডুমুর গাছের নিচে হলুদ পাতার ছড়াছড়ি,
ঐ দ্যাখো, গোয়ালঘরের পাশে এলোমেলো খড়,
দু একটা ঠোঁটে তুলে নাও,
দু একটা খড়কুটো কোথাও গোছাও।'

আমিও তো আকাশের দিকে চেয়ে থাকি,
বনের মাঠের দিকে, গাছের সবুজ ডালে, ছাদে ও উঠোনে,
পাখিদের চলাফেরা, ভালোবাসা দেখি।
ঘাসের নরম শীষে আলগোছে পা ফেলে পা ফেলে
পাখিদের যাতায়াত, কলহ ও কিচির মিচির।
আমিও কিছুটা বুঝি, আমার পাখিও একদিন,
একদিন আমাকেও চিনে ফেলে, এসে বসে আমার জানলায়
বলে, 'চলো উড়ে আসি,'
আমি বলি, 'বলো কত দূর?'
মৃদু হেসে পাখি বলে, 'যত দূর উড়ে যাওয়া যায়।'

ভালোবাসা / অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রতিমা আসে না।
দর্শন, ভাব কিছুই আসে না। দৌড়ে
যা ছুঁতে চেয়েছি—
শাদামাটা, আটপৌরে।

কাটা – ছেঁড়া – খোঁড়া
যেখানে যা পাই—জুড়ি।
দুই করতলে চিকচিক করে
রক্তকাঁকর, নুড়ি।

কালোকেলো খোকা সঁপেছে আমাকে
ভিটামিনহীন হাসি,
বুকের দরজা হাট হাট খোলা—
ভালোবাসি। ভালোবাসি।

মৌন / মণিভূষণ ভট্টাচার্য

বসে ছিলো। আমি তাকে কিছুই বলিনি।
আলোয় পেছন ফিরে জরদগব, পিঠ বেঁকে গেছে,
অনেক কথার কথা বলে গেল—
কী করে মাছেরা শূন্যে লাফ দেয়,
বাণিজ্যকে ঘিরে
কীভাবে দারুণ ফূর্তি জমে ওঠে—
কিংবা গবেষণালব্ধ ট্যাকিঅন,
কী করে জলের স্রোতে কিম্বদন্তি ভেসে আসে—
অনেক আগেই পচা মাংসের স্তূপের পাশে বসে
শুনে গেছি, আমি তাকে কিছুই বলিনি।
পেছনে ছড়িয়ে থাই মৃতদেহ চলে যায়, শোকে
নানাবিধ সংকীর্তন হয়,
আমার বিপদ সে তো কাছে বসে আছে,
আমি তাকে নড়াতে পারিনি,
উন্নতির কথা শেষ হলে
অন্ধকার ঘিরে আসে
উঠি - উঠি ক'রে পাথরের মত
বসে থাকে, পেটভরে পচা গন্ধ পাই,
আমি তাকে কিছুই বলিনি—
শুধু এক খড়্গহস্ত সময়ের প্রতীক্ষায় থাকি।

হিমের রাতে খোঁজা / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

হিমের রাতে খোঁজা মানুষ আঁতিপাতি
কাচের পরে ভাসে হলুদ মৃদু বাতি
পাথর ছুঁয়ে শুধু গড়িয়ে যায় চাকা
একটি মানুষের পাথরই হয়ে থাকা

পুরানো সফরের বিপুল ছিল ঋণ
পাথর হল তাই চলৎশক্তি হীন
শীতল শিলা খুঁজে শ্যামল পদপাত
অপরিসীম দুখে ভরেছে দুই হাত—

হিমের মাঝরাতে পুরানো সব সরে
হাতেতে হাত যদি রাখিতে এ সফরে

আঁচড় / মতি মুখোপাধ্যায়

আঁধার জলের থেকে আসে কেউ কেউ
উঠে আসে মরাল গ্রীবার মতো শাদা
ছন্দোবদ্ধ দিন
ঝরে যেতে জল
ফিরে যায় রাজেন্দ্রাণী যেন
ধীর পায়ে সরসীর জলে।

পড়ে থাকে ছাপ
কমলা পায়ের
এবং মাটিতে
নখের আঁচড়।

একানড়ের সঙ্গে কথাবার্তা / প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

একপায়ে চলেছো কোথায়, একানড়ে? তোমার তো একদিন
দুটি পা-ই ছিলো।
তোমারও তো মানুষজন্ম ছিলো একদিন, নাকি তুমি বরাবরই ভূত?
রাতবিরেতের বাঁশবনে ডোমকানা সেজে, তারপর টেমি জেলে ধ'রে
কোথায় চলেছো, তা এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।
আমরাও মাঝে মাঝে নুলো হ'য়ে যাই, একপায়ে
ধুলো ঘষ্‌টিয়ে দুহাতে কাঠের ক্রাচ শূন্যে তুলে
জলে ছুঁড়ে দিই—
তবে কি আমরা ভূত, একানড়ে, বলো, আমরা কি তোমার মতো।
নাকি ভূত-মানুষের এই হার্ড পেন্সিলের আঁকা মরু বিভাজন
কে যেন চকিতে তুলে দিয়ে, পৃথিবীকে
ট্রেসিং কাগজ ক'রে শূন্য, শূন্য, শূন্য বানিয়েছে।
কিছু ভরতুকি চাই, একানড়ে, তুমি ভৌতিক উপায়ে
আমাদের মানবজমিনে একঠ্যাঙে লাফিয়ে লাফিয়ে
কিছু গম কি ধানের চারা পুঁতে দাও—
আমরা ন'ড়ে চ'ড়ে আবার জলের নিচ থেকে যষ্টি কুড়িয়ে
আলপথে হেঁটে আসি টুপি-পরা বি, ডি, ও-র মতো।
ভূতে ও মানুষে কিছু যোগাযোগ হোক, একানড়ে—
নইলে নিঃসঙ্গ লাগে এইসব মাঠঘাট পথের ওপরে।

মহাকাল-১ / সোমক দাস

প্রতিভা, দোলায় তোমাকে।
অভিমানে, নেশায় নেশায়
মেখে-পা, বেজুল দেমাকে।

তোমাকে, মেনেছি মন্দিরে।
রাগে ঘাড়, বেঁকিয়ে থেকেছি
ঘরে আর, নিভৃত চত্বরে।

হে প্রেম, হাসছো আড়ালে
প্রচেষ্টায়, ত্রুটি তো ছিলই
শেষে সেই, প্রণামী দেওয়ালে ?

নির্বিষ, ফণার মাথায়
জমা হয়, সিকি ও আধুলি
সাপুড়ে, কাকে যে দোলায় !

খেলা / প্রমোদ বসু

এই খেলা শেষ হবে কবে ?

আমরা বলেছি 'যাবো, নৌকো ঘাটে এনো',
অথচ যাইনি আর মিথ্যা বদভ্যাসে।

জানি, ঘাটে এসে অতি সরল সে-মাঝি
বসেছিল দীর্ঘক্ষণ আমাদের মুখের কথায়।
জলের সারল্য তার, নিষ্পাপ, নিয়তিবিমুখ।
ফিরে গেছে, ক্ষমা করে হয়তো নিশ্চিত।
কিন্তু কী পাপে আমরা তাকে ঠকিয়ে এসেছি,—
খেয়ালের বশে ? নাকি, জলে প্রকৃতই ভয় ছিল ?

পাছে, পাপ ও-জলের শাসনেতে টানে ?
টেনে নিয়ে যায় নিচে, যেখানে গভীর
স্রোতের স্বভাবে খেলে মূর্ত পরিত্রাণ ?

সে-খেলা সম্মানে বড়ো। নীচ এই আমাদের খেয়ালের খেলা।

বোধ্র / বিশ্বনাথ গরাই

সমস্ত নিঃশেষ কোরে বসন্তের দিকে গেছে উড়ে
সুবর্ণরঞ্জিত সেই পাখি—উদোম উঠোন জুড়ে
ত্যক্ত অবশেষ খোঁটে মরা বিকেলের শেষ আলো—
তস্করের মতো সন্ধ্যা কালো রক্ত আকাশে মেশালো।

কপালের শ্রান্ত ভাঁজে বিষণ্ণ যুদ্ধের ম্লান স্মৃতি—
জীবনের নদীগুলি ভুলে গিয়ে অমেয় সম্প্রীতি
মিশে গেছে সুকল্যাণ সময়ের তীব্র নীল বাঁকে—
এখন তোমার রাত্রি ক্ষুধার বিমূর্ত ছবি আঁকে।

নিরুক্ত প্রহরে কোথা বেজে ওঠে তীব্র সাইরেন—
তোমাকে উচ্ছিষ্ট রেখে প্রগতির দ্রুতগামী ট্রেন
গিয়েছে কোথায় দূরে, রেখে গেছে শূন্য শাদা বোধ—
তোমাকে বাঁচাতে পারে, কোথা সেই আদিগন্ত রোদ ?

মাতৃভাষা / কৃত্তিবাস রায়

নির্বাসন কাকে দিতে চাও ? মাতৃভাষা ?
যীশু কিন্তু যে ভাষায় কথা বলতেন
তার নাম হিব্রু কিংবা ল্যাটিন ছিল না।

তবে পরিব্রাজকের ভাষা অন্য ছিল
ফলে সনাতন ধর্মসভা ছড়াল জগতে

জাগতিক সুখ-দুঃখের অংশীদার হল ধার্মিক সেনানী
আর তার প্রিয় বাক্যে, খাক চাতুর্যে
ভরে গেল দূরে নীলাঞ্জন স্তব্ধ ঝাউতলা।

সুরে বেঁধে রাখি / সুজিত সরকার

ঘুমোতে যাবার আগে টেপরেকর্ডারে
গান শুনি
অথবা সরোদ অথবা সেতার—
সুরে বেঁধে রাখি প্রতিদিনের আনন্দ,
প্রতিদিনের বেদনা।

সব জিজ্ঞাসাচিহ্নকে নিয়ে যেতে হবে
পূর্ণচ্ছেদে।

শুকনো ডাল, নুড়ি, কাঠকুটো—
মিলেমিশে হয়ে যায় কুটুমকাটাম।

সুরে বেঁধে রাখি প্রতিদিনের আনন্দ,
প্রতিদিনের বেদনা।

ফুল ফুটে আছে / সুভাষ মজুমদার

ফুল ফুটে আছে তোমার দুঃখ থেকে
ঝরে পড়ে আছে শিশিরের কিছু কণা
তবু তুমি কেন তোমার গোপন কথা
এ সময়ে এসে আমাকেও বলছো না?

দিন কেটে যায়, যেতে হবে আরো দূরে
চোখে এসে পড়ে অরুন্ধতীর আলো
শুধু মনে ভাবি স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি
প্রিয়তম সুখ হয়তো কখনো ছিলো।

শব্দের পরগণা ভেদ করে / শৈলেন্দ্র হালদার

যখন তুমি
সবুজ দিগন্তে নেচে ওঠ স্মরণীয় উল্লাসে
যখন শাওলিনগরে নীল জোছনায়
পদ্মপাতার ঠোঁটে তোমার হৃদয়
বেজে ওঠে বিভাসবীণার টানে
যখন অনুবাদের নেশায় তুমি মাত
শারদীয়ার গানে
কোথায় ছাড়বো আমার ঘোড়া?

অনন্তকাল প্রাসাদ ছেড়ে
শব্দের পরগণা পেরিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি
যেখানে সংসার নেই নিসর্গ নেই
যেখানে একাকীত্ব রাত্রির চেয়েও একলা
যেখানে নিঃসঙ্গ প্রেম অতৃপ্ত ফেরার
সেখানে হাঁটতে আমার অসহ্য অসহ্য।

আমার পূজার ফুল নিয়ে অনুভব, আকুলতা নিয়ে
পিতৃপুরুষের পথে, শব্দের পরগণা ভেদ করে
তোমার, তোমার কাছেই ফিরে এসেছি
তুমি হাত ধরো।

সমুদ্র না, নদী / কাশীনাথ বসু

সমুদ্রে ঢেউ বেশি উত্তেজনা
তবু এই নদীটি নিয়েই থাকবো।
ছোট – ছোট জলযান যাবে আসবে
প্রতিটি জয় থাকবে হাতের মুঠোয়।
হাওর, কুমির নেই, নিরুপদ্রব
সমুদ্র থেকে দূরে
থাকলে থাকবো নদীর ভিতরে।

ঝিলিমিলি / জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়

পর্যটন-দপ্তরে তার কথা প্রথম শুনি।
'এখানে এখনও কিছু আছে, কি দরকার বাইরে যাওয়ার ?
জায়গাটা দারুণ, ক'দিন পরেই দেখবেন কেমন হয়ে গেছে,
ওখানে খোঁজ চলছে তামার খনির, কিছু করবার
কথা ভাবছি আমরাও ;
বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য
তামার খনি এখনও খুঁজে পাননি।'

এ-সব শুনতে শুনতেই
চোখ পড়ে যায় একটা ছবির দিকে ঃ
শালবন, ভেতরে পড়ন্ত রোদের ঝিলিমিলি,
নীচে শুকনো পাতা।

মাছি ওড়ে / দীপক কর

মানুষ ফুরিয়ে গেলে মানুষের কাছে
কী থাকে আর ?
বেঁচে থেকে কী লাভ তখন—
বলো, কী লাভ ? কী লাভ ?
হিজলের নরম ছায়ায়
ঘুমিয়ে-পড়া-শৈশব
জাগবেনা কোনোদিন
জাগবেনা আর।

মানুষ ফুরিয়ে গ্যাছে কবে
মানুষের কাছে
এতো সাধ এতো আহলাদ
মাছি ওড়ে, শুধু মাছি ওড়ে।

যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি

শিবশম্ভু পাল

১।। অফ-সাইড

—মুকুটমণিপুর কবে গিয়েছিলেন আপনি ?

সহকর্মী বন্ধুর গলায় প্রশ্নের সঙ্গে কৌতূহল এবং কৌতূহলের সঙ্গে বিস্ময় একাকার হয়ে যায়। তাঁর এরকম ট্র্যাজুলার জিজ্ঞাসার কারণ তিনি এবং আমাকে যে দু-চারজন চেনেন, তাঁরা জানেন, নিজের ঘরটুকু ছেড়ে আমার দৌড় বড় জোর কর্মস্থল পর্যন্ত। কলকাতা ছেড়ে পারতপক্ষে কোথাও আমি নড়ি না, এটা এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্য, যা, গর্ব এবং লজ্জা—এই পরস্পরবিরোধী অনুভব থেকে সমদূরবর্তী। শহরের বাইরে নানান জায়গায়, এমনকী রাজ্যেরও বাইরে, আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, প্রাক্তন ছাত্ররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ; তারা কত অনুরোধ, কত আমন্ত্রণ জানিয়েছে। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যাব বইকি' বলে হেসেছি। হাসিটা নাস্ত্যর্থক। শুনে স্ত্রী ঠোঁট বেঁকিয়ে এবং প্রোপোরসানেটলি ভাষা ও মৌল পরিসংখ্যাও, বস্তুত এমন সূষম ও সর্বাঙ্গীণ বঙ্কিম ঠামের জন্যে তাঁকে সে-সময় একটু সুন্দরীও মনে হয়, তো এইরকম মোহন ভঙ্গিমায় তিনি সরবে অনাস্থা বিস্ফোরণ করেছেন ঃ 'থাক, মিথ্যে কথা বোল না। তুমি যাবে বাইরে ? সত্যি, আপনারা একে চ্যাংদোলা করে খাট থেকে তুলে নিয়ে যান ত। সেই একঘেয়ে বিছানা, ইস্কুল, 'প্রতিক্ষণ' অফিস—এসব নিয়ে ও কী পায় কে জানে, কী করে যে পদ্য লেখে কে জানে বাবা।.....' তাই তো। কী করে কবিতা লিখি, অ্যাঁ, এরকম ঘরকুনো হয়ে বসে থাকলে লেখা যায় ? আমাদের স্কুলে শেষ-ডিসেম্বর কি প্রথম-জানুয়ারিতে মাস্টারমশাইরা একটা বাৎসরিক পিকনিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। ফি-বছরই আমাকে কেউ-না-কেউ বলেন, তাঁদের মধ্যে উপর্যুক্ত সহকর্মীও আছেন, 'ওহ, আইডিয়েল পিকনিক স্পট। পাশেই নদী, নির্জন জায়গা, নারকেল গাছ, সরু মেটে রাস্তা, ধানক্ষেত,

ওখানে গেলেই, শিববাবু, অন্তত ডজনখানেক কবিতা আগ্‌সে বেরিয়ে আসবে।' পিকনিকে অবশ্য যেতেই হয়, সেটা সামাজিকতার ব্যাপার, যেমন বিয়ের নেমন্তন্ন, কিন্তু তার সঙ্গে কবিতাকে জড়াই না। গেলুম, হৈহৈ করলুম, অবেলায় খেয়ে একবুক অম্বল নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে বিছানায় দেহ নিক্ষেপ করলুম, হয়ে গেল। পিকনিকের পাড়াগাঁ, আমার কাছে অন্তত কলকাতারই যৎকিঞ্চিৎ ঐকাহিক সম্প্রসারণ, আর-কিছু না। আসলে কবিতা নিয়ে আমার কোনো সংস্কার নেই।

বন্ধুকে বললুম—মুকুটমণিপুর জায়গাটা খুব সুন্দর, না?

—সে ত আপনিই ভালো বলতে পারবেন। 'দেশ'-এ কবিতা লিখেছেন, তাতে ঐ জায়গাটা মেনশন করেছেন, দেখলুম। ভাবলুম, শিববাবু আবার কবে কনডাকটেড ট্যুরে ওখানে গেলেন। কই, ছুটিটুটি নিলেন না, অথচ—কী ব্যাপার, পূজোর ছুটিতে কি—

—নাহ্, পূজোর ছুটিতে এখানেই ছিলুম, যেমন থাকি আর কি। —তারপর সামান্য নাটক করবার লোভ সামলাতে না পেরে বন্ধুটিকে পূর্বাপরহীন জিগ্যেস করলুম ঃ অজিতকে চেনেন, মাঝেমধ্যে ডাকতে আসে এখানে?

—আপনার বন্ধু অজিত মুখার্জি? বঙ্গবাসীর ইংরিজির প্রফেসর?

—রাইট। কিন্তু নামটা একটু ঠিক করে বলুন, অ্যাজ হি লাইকস ইট টু বি কলড, অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। আদরওয়াইজ সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়, কারণ অজিত মুখার্জি নামটা তো খুবই কমন, এতে ওর সঠিক আইডেনটিফিকেশন হয় না।

—সে তো এখানে সামনে নেই মশাই। কিন্তু হঠাৎ অজিতবাবুকে এর মধ্যে টেনে আনলেন কেন, বুঝতে পারছি না। এ-ও দেখছি আপনাদের কবিতার মতো হয়ে গেল। ধ্যাৎ তেরি—সহকর্মী খবরের কাগজটা টেনে নিতে যাচ্ছিলেন। বাংলা কাগজ, অনেক টকঝালমিষ্টি ল্যাবেনচুষ পাওয়া যায়, আমার উল্টোপাল্টা কথার চেয়ে ঢের ভালো জিনিশ।

তবু বাধা দিলুম ঃ অজিতকে কিন্তু আপনিই টেনে আনলেন, আমি না।

—মানে? আপনি নিজেই তো ওনার নাম করলেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু কে আপনাকে কবিতাটা পড়তে বলেছিল? আপনি তো কবিতা পড়েনই না।

—ঠিকই, একজনের বাড়িতে 'দেশ'টা দেখছিলুম। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে দেখলুম আপনার নাম। চোখটা আটকে গেল। তারপর দেখলুম, মুকুট-মণিপুর।

—বেশ করেছেন। কিন্তু এই নিয়ে জিগ্যেস করে ভারচুয়ালি অজিতকেই ডেকে আনলেন। কারণ ও-ই ফ্যামিলি নিয়ে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল, আমি না। ওর মুখ থেকে শুনে—

—কী করে জানব বলুন। তাহলে মিথ্যে কথা বলেছেন বলুন।—যেন ফাঁকায় পেয়ে বল জালে জড়িয়ে দিলেন।

—কবিতাটা কিন্তু মুকুটমণিপুর নিয়ে নয়। যেন আমি অফসাইড রুলিং দিলুম।

—কী নিয়ে?

উত্তরে খবরের কাগজটা এগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

২ ।। টিনের তলোয়ার

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এর ট্রেন স্টুডিয়োর মধ্যে বংশী চন্দ্রগুপ্তের তৈরি। স্পিলবার্গের জস্-এর হাঙরও তাই। কিন্তু তাতে কী? ছবি তৈরির কায়দায়, ক্যামেরার শিল্পিত কারসাজিতে ছবিটাই মুখ্য হয়ে ওঠে কোনো-না-কোনো আবেদনে। ইনডোর সুটিং-এর চালাকি ফাঁস হয়ে যায় সাংবাদিক-দের গন্ধচেতন পেশাদারি সন্ধিৎসায়, রিলিজের আগে, পরে, বা সমকালে, যখনই হোক। সেটা আলাদা করে তথ্য হিশেবে মন্দ লাগে না। সিনেমা শুধু বহির্দৃশ্য বা লোকেশন-এর জোরে উৎরোয় না, দরকার কল্পনাপ্রতিভার সমর্থ ও সুমিত বিন্যাস, ফরম আর কনটেন্ট সম্পর্কে সৃজনশীল প্রজ্ঞান, একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা মনোভঙ্গিকে দর্শকদের গ্রহণক্ষমতায় সংশ্লিষ্ট করে তোলা। আকাশ সমুদ্র পাহাড় সুন্দরবন সিঙ্গাপুর মানেই ভালো ছবি নয়,

যদিও ভালো ছবিতে আকাশ সমুদ্র পাহাড় সুন্দরবন সিঙ্গাপুর থাকতেও পারে। সেটা পরিচালকের অভীপ্সেটর সঙ্গে সম্পর্কিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা। হিল্লিদিল্লি ঘুরে বেড়ালে বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'ভূগোল' হয়তো বাড়তে পারে সাহিত্যের; পটভূমির নিসর্গ বৈচিত্র্য পাঠকদের টানতে পারে, এমনকী আমাকেও, কিন্তু প্রায়শই সেসব ফুটপাতের আদার রস দেওয়া চায়ের মতো। আদার ঝাঁজটুকুই থাকে, চা আর থাকে না।

নিজেকে উপর্যুক্ত দিকপালদের সঙ্গে শঙ্কনীভুক্ত করার ধৃষ্টতা আমার দূরতম দুঃস্বপ্নেও নেই; কিন্তু আমার একটি কবিতায় মুকুটমণিপুরের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড উল্লেখের সপক্ষে ঐ নাম দুটি মনে পড়ে গেল, এবং মনে পড়ার ফলে মনের জোরও বেড়ে গেল অনেকটা। এই মুহূর্তে আবার আর-একটা নামও মনে এল। বিভূতিভূষণ। বই পড়েই ঘরে বসে তিনি লিখে ফেললেন 'চাঁদের পাহাড়'-এর মতো রুদ্ধশ্বাস ও সুস্বাদু একটি অ্যাডভেঞ্চার, যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আন্তর্দেশিক বাউণ্ডুলে বলে প্রকারান্তরে জানিয়ে দেন তাঁর জর্ণালধর্মী রচনামালায়। আমি অবশ্য দুরারোগ্যরকম ঘরকুনো। কিন্তু এর ফলে আমার কবিতাচর্চার কিছু এসে গেছে কি? যা লিখতে চাই, তা-ই লিখতে চেয়েছি; এবং প্রায়ই তা লিখতে পারিনি। কিন্তু সে তো শিল্পেরই অনপনেয় অভিশাপ। সেইসঙ্গে ধুনোর গন্ধও আছে। দুচার লাইন বা দুচার স্তবক একটানা লেখার পরই সন্দিগ্ধ অফিয়ুস-এর মতো ফিরে তাকাই, আর সেই আরব্ধ শব্দমালার ইউরিডাইস শূন্য হয়ে যায়। উপমাটি বিচ্ছিন্ন; কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো বোঝানো গেল। এত সন্দেহ, এত খুঁতখুঁতুনি ভালো না।

আসল কথা, কলকাতায় থাকতে-থাকতে থেকেই গেলুম।

সহজাত আলস্য, পৈতৃক তথা পারিবারিক স্নেহের সশঙ্ক বাঙালি দুর্বলতা, নিরাপদ জীবনচর্যার মোহ, গ্রামণিক সমস্যার উত্তরোত্তর জট ইত্যাদি নানান বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কারণের প্যাকেচক্রে আমি বিছানায় স্বেচ্ছাবন্দী। লাল আণ্ডারলাইন করা দরখাস্তের মতো প্রেসি করে নেওয়া কাটছাঁট একটি কলকাতা, যার শুরুতে বিছানা, সারাতেও তাই। মাঝখানে কর্মস্থল, ট্রামবাস, সকালে ভাঙা কড়াইস্থি পাঞ্জাবি বিকেলেই সাতবাসি, যৎকিঞ্চিৎ বন্ধুবান্ধব। এবং বাড়ি। হ্যাঁ, খুবই ইত্যাদিমার্কা এই জীবন, সন্দেহ নেই। সেরকমই

নিশ্চরিত্র, ভিড়ে-হারানো আমার চেহারা। এবং নাম? হায়, সেটা চিটেগুড়ের ব্যাপারিসমাজে মানানসই হলেও কাব্যপাঠকদের পক্ষে বিলক্ষণ শ্রুতিপীড়ক। এমনিতর সর্বাঙ্গীণ অকাব্যিকতার মধ্যে থেকে তিরিশ-বত্রিশ বছর ধরে—

আগেই বলেছি, কবিতা নিয়ে আমার কোনো সংস্কার নেই। বরং বলা যেতে পারে, তথাকথিত অকাব্যিকতার ভেতর থেকেও কবিতা নিষ্কাশন করে আনার জোর আমার কলমে আছে কিনা পরখ করে দেখতে চেয়েছি। আমার কবিতা হয়তো আমার আটপৌরে দিনরাত্রি, চেহারা আর নামের বিরুদ্ধে শতবর্ষের ধর্মযুদ্ধ। অন্তত ধর্মযুদ্ধের ছলনা, যদি কলমটাকে মনে করি টিনের তলোয়ার।

ক্লান্তি, অবসাদ. বিরক্তি, বোরডম থেকে নিস্তার আমার কেন. কারোরই নেই, সে যতই প্রকৃতিপ্রেমিক হোক আর বাইরে-বাইরে ঘুরুক। নিরঙ্কুশ ভালো থাকা মনে হয় কোনো বোধসম্পন্ন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পরন্তু, সত্যি বলতে কী, বেড়ানো ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের কাছে কাঁচা পয়সা খরচের একটা উপায় মাত্র। বেড়ানো মানে রঙিন ফোটো-গ্রাফের লোকেশন, বেড়ানো মানে পাঁচজনের কাছে গল্পগাছার বিষয়, বেড়ানো মানে কিছু শৌখিন কাপড়চোপড় আর ঘরসাজানোর জিনিশপত্র কেনার বাজার। এবং বেড়ানোটা কারোকারো কাছে জীবিকাও বটে। যেমন, সুটেড-বুটেড ফিরিওলা, মুখ্যমন্ত্রী, রাজনীতির ব্যাপারি প্রভৃতি। আর বিস্ময়ের তাগিদে বেড়ানো সে তো চোখ আর মনের গ্রহণক্ষমতার বিষয়, সুতরাং চৌকাঠের অনতিদূরের শিশিরবিন্দু থেকে শুরু করাই ভালো। আমি ঘরকুনো হলেও শিশির অধ্যয়নের কাজটা কোনো-না-কোনোভাবে করতে থাকি, করতেই থাকি। যাই হোক, একঘেয়েমির হাত থেকে কারোরই নিস্তার নেই যখন, তখন আমি স্বজন-বন্ধু-সহকর্মী-পরিচিত-অপরিচিত সকলের সঙ্গে এই সূত্রে ঐকাত্ম্য বোধ করি, কলকাতাসর্বস্ব আমি আর বৈচিত্র্যপ্রবণ অন্যান্যদের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য দেখি না। এবং আনন্দেরও উৎস এই দৈনন্দিনেই মেলে। আনন্দই হোক, আর বৈচিত্র্যই হোক, সেটা ভূগোলনিরপেক্ষ একটা চৈতন্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগে, সহমর্মিতায়, পরিপার্শ্বের সব-জেকটিভ নাটারূপে, নবীকরণের আন্তর তাড়নায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের ভেতর থেকেই ক্লান্তি আর উদ্দীপন,

বোরডম আর পরিত্রাণ, বিরাগ আর অনুরাগ জন্ম নেয়, মরে, আবার জন্ম নেয়, আবার মরে। কখনই থেমে থাকে না আভ্যন্তর জন্মমৃত্যুর এই ধারাবাহিক পালাবদলের পদ্ধতি। এভাবেই অভিজ্ঞতাকে বাজিয়ে নিতে হয় উপলব্ধির ভেতরে; এবং কবিতা সেই উপলব্ধ অভিজ্ঞতারই সারাৎসার। তাই নবকুমারের ধরনে বলতে ইচ্ছে করে, যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি তবে দেশভ্রমণে যেরূপ ইহকালের কাব্যকর্ম হয়, বাটি বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।

৩ ।। কানাখোঁড়ায় গল্প

মুকুটমণিপুর কেন, জয়পুর-মধুপুর-কানপুর—মোট কথা, চিৎপুর ছাড়া যে কোনো পুর হলেই কাজ চলে যেত আমার।

কিন্তু কেন? এতক্ষণ আত্মপক্ষ সমর্থন করে যা বললুম তার সঙ্গে চিৎপুরের সামুজ্যই তো স্বাভাবিক ছিল। তবে সেইসঙ্গে একটা সুভাষিত—সে কি এমনি-এমনিই সুভাষিত?—'কানাখোঁড়া দুগুণ বাড়া', মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কোথাও না যাবার মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব থেকেই স্থল-জল-অন্তরীক্ষ সর্বত্রই আমার গতি, মনেমনে হারিয়ে যেতে তো বাধা নেই। বস্তুত আমারই দেওয়া খড়ির গণ্ডি আমারই আরোপিত ভিড় আর ব্যস্ততার কলকাতা, কলকাতারও আবার সংক্ষেপীকরণ, রেশনের লাইন, মেয়ের পড়া-শুনো, স্ত্রীর হাঁপানি আর বৈধ ভালোবাসার টান, বিছানার তাকিয়া, ডাক্তারখানা, পরীক্ষার খাতাদেখা—এসবের মধ্যে শিশিরচর্চার ছোটখাটো ঘরোয়া রোম্যান্টিকতা কখনো-কখনো সেই ছাড়পত্রহীন মানসভ্রমণের স্বাধীনতাকে দৈনন্দিনের ঘেমো ভিড়ের মধ্যে আচম্বিতে খোঁপার বেলফুলের গন্ধের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়। খড়ির গণ্ডি তখন আমন্ত্রণের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে অসীমান্ত তাৎপর্য পেয়ে যায়। সেই বিভ্রমেই একদা একটি সমাজবিরোধী কর্মে জড়িয়ে গিয়েছিলুম। দু-নম্বরি ভালোবাসার ব্যাপার। ঘোরতর গৃহদাহ। সকলেই হায়-হায় করল, ছ্যা-ছ্যা করল, লাল দমকলের অস্থির ঘণ্টা, হোসপাইপের সে কী তোড়ে জল-ছোটানো! বছরদেড়েক পর আগুন নিভল।

কৌতুক ও আশ্চর্যের বিষয় এই, অগ্নিযোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখাল ঐ মেয়েটিই যে আমার সমাজবিরোধিতার মূর্তিমতী প্ররোচনা। হঠাৎ দেখা গেল, দুপুর হলেই দরজায় তালা দিয়ে সে কোথাও-না-কোথাও বেরিয়ে গেছে। রাজসাক্ষীর বিশ্বাসঘাতকতা আর কি। যাই হোক, সে অনেক কথা, এসব অভিজ্ঞতা ভাঙিয়ে খানদুই গল্পও লিখে ফেলেছিলুম এবং অগুনতি কবিতা। বৈষ্ণব পদাবলির চোঁয়া ঢেঁকুর। আমি নিজেই সেসব পড়ে আজকাল, পইতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী আমি, মুচকি-মুচকি হাসি এবং আত্মঘাতী ঠাট্টা করি। ঘটনাটি—আমার জলো, নিরিমিষ্যি জীবনের পক্ষে একে 'ঘটনা' ছাড়া কীইবা বলতে পারি—সপ্তম দশকের (১৯৬০-৭০) মাঝামাঝি ঘটাই এবং বছরদেড়েক পর—নাহ্, বিপ্লব আর এ-দেশে হল না দেখছি। সর্ষের মধ্যেই ভূত, দলের মধ্যে দল, উপদল, গা বাঁচানোর ধান্দাবাজি, নইলে দুপুর হলেই দরজায় তালা দিয়ে ভদ্রমহিলা পালিয়ে-পালিয়ে যেতেন কেন। এবং সন্ধে হলেই সুড়সুড় করে আমি বিস্কুটের প্যাকেট, ডিটারজেণ্ট পাওডার, চানাচুরের ঠোঙা, শ্যামবাজারের কষামাংসের ভাঁড় নিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ি কেন।

কিন্তু যতই ঠাট্টা করি, কিছুই হারায় না।

সুতরাং একদিন ওকে, বছর তিনচার পর, রাস্তায় দেখতে পাই, বিধান সরণীর এক রমণী-অধ্যুষিত সন্ধেবেলায়। হন্তদন্ত হাঁটছে, বোধহয় থার্ড বেল বেজে গেছে কোনো সিনেমাহলে। ইশ, কী বিশ্রী বেঢপ চওড়া হয়ে গেছে চেহারা, পিঠের নীচে তিনটে মাংসের সিঁড়ি, এবং কোমর, পিঠ, শ্রোণি সব একদেহে লীন হয়ে ঢাবঢেবে চলন্ত একটি ভারততীর্থ। ট্রাম থেকে নামতে চাইলুম, পারলুম না। কে আমাকে রুখে দিল? আমারই অন্তর্গত একটি উপদল, যে সংবিধানের মধ্যে থেকে শস্তায় কাটাপোনা কিনতে চায়। আমি বসে রইলুম, কিন্তু বসে-বসে কখন একসময় ওকে ১৯৬৫-র নীল আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের জোড়াসাপ প্যাটার্নে বুনে ফেললুম। পাপের এমন চমৎকার ডিজাইন আর কোথায় পাব। ট্রাম থেকে শ্যামবাজারের মোড়ে নামবার সময় ওকে হাত তুলে পরিষ্কার বলতে শুনলুম: 'তাহলে ঐ কথাই রইল, আড়াইটে, বাগবাজার মারাঠা ডিচের ধারে ……' প্রতিবন্ধীদের এরকমই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অপসংস্কৃতি থেকে যায়।

৪ ॥ পোড়া সিগারেট বনাম পেঙ্গুইন

হাম্পি খাটে বসে নিষিদ্ধ জিনিশগুলোর দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। খবরের কাগজ, বোর্ডফাইল, দুটো ডটপেন, ট্রানজিস্টার সেট, অ্যাশট্রে, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, তাকিয়া এবং তাকে চ্যাপটা করে থার্টি-ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হেলে আমি, বাঁদিকের জানলা থেকে সকাল আটটার রোদ যেন তাপস সেনের কায়দায় তেরছা হয়ে বিছানায়, ডানদিকে হাম্পি, হাম্পির পেছনে খাটের ছতরি থেকে ঝুলন্ত বেডসুইচ, সামনে ওর প্রথমবর্ষপূর্তি উৎসবে উপহৃত একটি পলিথিনের রঙিন লাইফসাইজ পেঙ্গুইন, ওর অনুমোদিত ও স্বাভাবিক বিনোদন। আমি খবরের কাগজের হেডিং দেখা ও সাতটা চল্লিশের রবীন্দ্রসংগীত শোনা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে টেনে নিয়েছি বোর্ডফাইল, যদি কিছু আসে। আর ওদিকে হাম্পি দেবদূতের ডায়ালেকটে প্রভূত বকে চলেছে আপনমনে, দাঁড়িয়ে উঠেছে টলমল করতে-করতে, আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখি। ওর লক্ষ্য ঐ বেডসুইচ, পেঙ্গুইন নয়। কিছুক্ষণ আগে রীনা খাইয়ে-দাইয়ে ওকে বড়জেঠু আমার কাছে বসিয়ে গেছে। দেখতে পেয়ে চট করে বেডসুইচের তার খাটের ওপর গুটিয়ে দিই, মৃদু বকে পেঙ্গুইনটা এগিয়ে দিয়ে ওর বাগ্‌ভঙ্গি নকল করে ঠোঁট শুয়োরের মতো ছুঁচলো করে আধোআধো আদুরে গলায় ওকে, 'ভয়, ঐ কালোছাতা, ঝুলঝাড়া, ভয়, এই নাও, খেলু-খেলু করো—' ইত্যাদি যথাসাধ্য অভিনয় করে বলি। কালোছাতা আর ঝুলঝাড়ার লম্বা লাঠি ওর দুঃস্বপ্নের সাবজেক্ট, কেন কে জানে, ও ঝপ করে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আঁট করে। শিশুস্বাস্থ্যের বিধি ভঙ্গ করে নিকোটিনের গন্ধভরা ঠোঁটে হামি খেতে থাকি, ওর দুধের গন্ধলেগে থাকা সাঁওতাল-সাঁওতাল পুরুঠোঁটে, লালা, আটখানা দাঁতের দানা কুটকুট করে বসিয়ে দিচ্ছে আমার ঠোঁটে, রেগে না আহলাদে ও-ই জানে, সর্বাঙ্গ স্নানশুদ্ধ, করে একসময় ওকে পেঙ্গুইনে নিবদ্ধ করে আবার কলম ধরি। অ্যাসট্রের খাঁজে আধপোড়া সিগারেট। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। দামি, চমৎকার, রঙিন পেঙ্গুইন ভুলে ও এবার অ্যাশট্রের দিকে থাবা বাড়ায়। অ্যাশট্রে সরিয়ে নিই। তখন লাল ডটপেন। এবার ও মরিয়া। নেবেই। দাঁড়িয়ে উঠেছে। 'ঐ কালোছাতা, ঝুলঝাড়া'—আবার আওয়াজ দিই পূর্ববৎ অভিনয় করে। ভয় পেয়ে দাঁড়ানো অবস্থাতেই পিছিয়ে যায়, আর—

ধুপ্। কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। এবং তারপর সরু তীক্ষ্ণ থিরথিরে আর্তনাদ। রীনা, আমার স্ত্রী, রান্নাঘর থেকে কীহল-কীহল করে ছুটে আসে। দোতলা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছোটকাকিমা, পাশের ঘর থেকে মা, ছোটভাই সকলেই। ন্যাড়ামাথা, বেশ লেগেছে। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না হাম্পিকে। রীনা বুকের দুধ খাওয়াতে ওকে কোলে নেয়। ওর কান্না সামান্য থামে, আবার ডুকরে ওঠে। কমলা কাক আর টিকটিকি দেখাতে ব্যস্ত হয়, আমি আবার কালোছাতা-ঝুলঝাড়ার সময়োচিত ব্যবহারে তৎপরতা দেখাই। এবং কাজ হয়। কান্না ভুলে ওর কোল থেকে মাথা তুলে মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন দুটিকে দেখে আবার ঝট করে মাথাটা ওর মায়ের বুকে গুঁজে দেয় ও দুধ শুষতে থাকে।

দৃশ্যটি দেখতে-দেখতে কখন যেন আমি হাম্পিকে এনলার্জ করতে থাকি, ওর পেঙ্গুইনবিরাগ আর অ্যাশট্রে ও ডটপেনে নিষিদ্ধ, অবৈধ অনুরাগ, ঝুলঝাড়া আর কালোছাতার আতঙ্কসমেত ওকে বাড়িয়ে নিতে-নিতে ও এক-সময় আমার অলটার-ইগোতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পেয়ে গেছি। যা ইদানীং মনেমনে চাইছিলুম, সেটা হঠাৎ, নিউটনের আপেলের মতো, পেয়ে গেছি। অত্যন্ত জরুরি একটা তত্ত্ব, পরিত্রাণের চমৎকার একটা হদিশ। আর তারপরই বোর্ডফাইলটা টেনে নিয়ে দ্রুত লিখে ফেলি : 'বিষাদ ভোলার জন্যে দরকার দ্বিতীয় বিষাদ ……'

৫ ॥ অপার্থিব থ্রি-ডি

অতঃকিম ?

বিষাদের এপিসেন্টারটি তো বুঝতেই পারছেন আপনারা। কিন্তু ব্যাপারটাকে কবিতার মধ্যে ধরার জন্যে একটু-আধটু আয়োজন না করলে চলে না। মনে হল, ঐ লাইনটার মধ্যে একটা নাটকীয় ঝাঁকুনি আছে। সুতরাং সেভাবেই মজা করে, খেলিয়ে, কখনো রং চড়িয়ে কখনো, হালকা করে, গ্রোটেস্ক ইমেজ আর অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বিষাদের চেহারাটা আঁকাজোকা করলে জমে যাবে হয়তো প্রথম লাইনের প্রস্তাবনা আর আলাপের কাজ, একধরনের ফলো-আপও বলা যেতে পারে। সেজন্যে শ্যামবাজার-বিধানসরণী

থেকে বেশ লম্বাচওড়া, ফাঁকা. অনেক বড় আকাশের নীচে যদি আমাকে সরিয়ে নেওয়া যায়. তাহলে বিচ্ছেদের একটা গমগমে স্টিরিয়োফোনিক প্রতিবেশ তৈরি হতে পারে। অথচ আমি মানুষটা আর-পাঁচজনের মতোই খাইদাই, কাজকর্ম করি, সংসার করি, স্টেনলেস স্টিলের থালা-গেলাস মার্বেল পেপারে মুড়ে নেমন্তন্ন যাই—এই মোটা খবরটাও জানাতে হবে। অর্থাৎ ঠোঙাভরা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না গোছের একটি ধাঁধায় জড়িয়ে গেলুম। থাক, পরে দেখা যাবে। আপাতত একটা সিগারেট ধরানো যাক। ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না। কবিতা জিনিশটা অনেকটা আমদের পাড়ার থ্রি-ডি বাসের মতো, দাঁড়ালেই মেলে না, ইনি আবির্ভূত হন, দৈবাৎ। শুভযোগেই বাস আর যাত্রী দুহুঁ হবার সুযোগ পায়।

—শিবু।—প্লুতস্বরে একটি আহ্বান দরজা, প্যাসেজ, উঠোনের বাতাস বেয়ে কানে এল। খুবই চেনাগলা। অজিত।

—চলে এসো।—আমিও অনুরূপ গলায় ওকে ডাকি।

রোগা, সরু, রোদ-বৃষ্টিতে আশুচেতন, তাই অতিরিক্ত প্রত্যঙ্গের মতো হাতে একটি কালো স্বয়ংক্রিয় ছাতা, বিদ্বান-কাম-কবিবন্ধু ঘরে ঢুকল। ওকে আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ, আমার যাবতীয় দোষ ও আণুবীক্ষণিক গুণের পরিমাপ সে করে যে-গজকাঠি দিয়ে তার নাম অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথমত, ও সিগারেট খায় না; দ্বিতীয়ত, সস্ত্রীক ও সপরিবারে সে বছরে একবার কোথাও-না-কোথাও বেড়াতে যাবেই; তৃতীয়ত, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, কোনো নেমন্তন্নই সে বাদ দেয় না; চতুর্থত, এম-এ পাশ ও কলেজে ইংরিজি পড়ায়; পঞ্চমত, ওর বয়েস আমার চেয়ে বছরদুই বেশি হলেও একটাও চুল পাকেনি এবং ঘন চুল কপালের দেড়ইঞ্চি ছাড় দিয়ে ওর মাথাটায় চেরি পালিশের মতো চকচক করে; ষষ্ঠত, বিজ্ঞাপননিন্দিত ওর দাঁত ও হাসি। বস্তুত ওর গুণের শেষ নেই। দোষের মধ্যে একটাই, শব্দদার প্যারোডি করে বলা যায়, ওর যে দোষ নেই সেটাই দোষ।

বন্ধু বিছানায় এসে বসল।

দাঁড়ান, আর-একটু ডিটেলের কাজ বাকি আছে। আমার ঘরে ঢোকার আগে রান্নাঘরে 'কমলা, আজ কী রাঁধছেন? গুড়জাউলি মাছ? সরষেবাটা

দিয়ে ঝাল? ফাস-ক্লাস। কত করে নিল? আমি আজ ট্যাংরা কিনলুম, জানেন, বেশ বড়বড়, জ্যান্ত, পঁয়তিরিশ নিল। হতভাগাটা তো আবার এসব খায় না। ওর বরাতে আলুপোস্তই জুটবে—' ('হতভাগা' বলতে আমাকেই ইঙ্গিত করল।) তারপর, মাসিমা, আপনার বাতের যন্ত্রণা কমেছে? আসন করুন, বুঝলেন, শুধু আসনই এর বেস্ট রেমেডি। আমার খুড়শাশুড়ি রেগুলার বজ্রাসন করে-করে এখন বেশ ফিট আছেন। আপনার জন্যে আসনের একটা চার্ট পাঠিয়ে দেব শিবুকে দিয়ে। আরে, লতাদি যে! লতা মঙ্গেশকর—কী খবর, মুখখানা কাঁদোকাঁদো দেখছি কেন? কোথায়, তোর মাকে দেখছি না, একটু বকে দিই। (লতা, 4, আমাদের ওপরতলার ভাড়াটের মেয়ে, ওর ডাকনাম লতা, সেই থেকে ও নিজেকে মঙ্গেশকর বলে আনন্দ পায়।) সবদিক অজিত বজায় রাখে। কমলা কি অমনি-অমনি ওকে পছন্দ করে!

'তারপর কবিবর, কী মহাকাব্য সংরচনা করছ' বলতে-বলতে আমার ঘরে, বিছানায়। ছাতাটা দরজার মাথায় ঝুলিয়ে রাখল।

—লেখা-টেখা আসছে না রে ভাই।—আমি দুঃখ করি: মাসখানেক ধরে খুবই মন্দা চলছে। রিসেশন, লিট্যারারি রিসেশন।

—কজনকে লে-অফ করলে?

—প্রাইভেট সেকটর, কুটিরশিল্প, সুতরাং লে-অফ করলে একজনকেই করতে হয়। সে তো অলরেডি হয়েই আছি। তোমার বাজার তো ভালোই। কাগজ খুললেই, তুমি। চিঠি-চাপাটি তো প্রায়ই পাচ্ছো। দেখি কী লিখেছ—বলে হাসিটাকে হুলের মতো ফুটিয়ে দিলুম ওর গায়ে। কারণ কিছু লেখা-লেখি করলেই ও সবকাজ ফেলে আমাকে পড়াতে আসে।

—তুমি না একটা যাচ্ছেতাই, ছোটলোক। কমলা তোমায় সহ্য করে কী করে, অ্যাঁ—অজিত বেশ চটে যায়: লেখা ছাড়া আমি তোমার কাছে আসি না? যাঃ শালা, লেখা আর দেখাবই না তোকে, চললুম—

—খুব হয়েছে। আর ন্যাকামো করতে হবে না। গুরুকে খিস্তি দিচ্ছিস, দে দে—মেজাজ এলে ওর মতো আমিও তুইতোকারিতে নেমে আসি: কে তোর ম্যানুসক্রিপ্ট এডিট করে, দেখব। কোনো মিঞা নেই রে, এই আমি ছাড়া—বুকে মিথ্যে ঘুষি মারতে থাকি।

—তোর মতো গুরুকে খিস্তি দেওয়াই উচিত। যে-গুরু অত খোঁটা দেয়, তাকে আমি ডিস্‌ওন করি।—তারপর গলা বাড়িয়ে বন্ধু হাঁকল : কমলা, চা—

—দিচ্ছি। আপনি বসবেন তো এখন কিছুক্ষণ?—রান্নাঘর থেকে ও সাড়া দিল। অফ্‌কোর্স।

—আমি কিন্তু আর মিনিটপনের পরই বাথরুমে ঢুকব। ইস্কুল আছে। তোমার মতো নাইট কলেজ নয়।—বন্ধুকে জানাই। দুঃখের সঙ্গেই জানাই, কেননা, জমাট আড্ডার একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে এখন।

—আমি তোমার কাছে আসি নি। এসেছি কমলার কাছে। দরকার আছে।—অজিত কথাযুতের রামকৃষ্ণের মতো আবছা হাসল : ওকে একবার ডেকে দাও, এক্ষুনি। দরকার আছে।

—ওটা তুমিই করো। কিন্তু কী ব্যাপার?

—ভয় নেই, তোমার সামনেই বলব, তখনই শুনবে। আর যাই হোক, আমি বিদ্যুৎ সেন নই, অ্যাণ্ড কমলা ইজ নো উর্মিলা।

(বিদ্যুৎ আর উর্মিলাকে নিয়ে দুটি আধা-আত্মজৈবনিক গল্প লিখেছিলুম একটা কাগজে। পরস্ত্রী আর পরপুরুষের গল্প। অজিত উর্মিলার আসল নাম বিলক্ষণ জানে।

কমলা চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল একটু পর। 'গৃহদাহ'-র চিন্ময় পেন্ডুলাম অচলার ধরনে সে আমাকে বলল—তোমাকে আর চা দিলুম না, এক্ষুনি তো ভাত খাবে।

—অজিত তোমার কাছেই এসেছে। দ্যাখো, কী বলে।—আমি ওকে যাবার বেলায় পিছু ডাকি, চৌকাঠ থেকে।

—হ্যাঁ, আপনার কাছেই এসেছি। ইতি পাঠিয়েছে। একটু দাঁড়াতে পারবেন? কিছু একটা উনুনে চাপিয়ে দিয়ে আসুন।

চাপিয়েই এসেছি। কী ব্যাপার?—কমলা আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিল : তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। দাঁড়ান, বিস্কুট দিচ্ছি, শুধু চা—

—লাগবে না।—বিস্কুটের অফার নাকচ করে দিয়ে অজিত বলল : শুনুন, সামনের ছুটিতে ইতিরা বাঁকুড়া যাচ্ছে। বাঁকুড়া-কাঁকড়াঝোড়-মুকুটমণিপুর।

আপনি যদি হতভাগাটাকে নিয়ে যান, দারুণ জমবে। কনডাকটেড ট্যুর। তিনচারদিনের প্যাকেজ। লাক্সারি বাস। ইতির খুব ইচ্ছে, আপনি চলুন—

—আমি তো রাজি। আপনার বন্ধুকে বলুন না।—যেন প্রমোশনের দায়িত্ব এড়াতে ক্লাসটিচারের সুপারিশ চাইলেন ঘাগু হেডমাস্টার।

—ব্যাস, ব্যাস তাহলেই হল। যান এবার—কমলাকে ছেড়ে দিয়ে বন্ধু আমার দিকে ফিরল : তাহলে এগ্রিড? তুমি, কমলা আর তোতন—তিনজন যাচ্ছ, তিনটে সিট রেখে দিতে বলি?

—দূর, কনডাকটেড ট্যুরে মানুষ যায়? অন্তত জনাপঞ্চাশ তো হবেই।—আমি ঠোঁট উল্টোই : অত ভিড়ভাট্টায় বেড়ানো যায় না।

—ও, ইতি, আমি এরা মানুষ নয়? একমাত্র মানুষ তুমিই। রিডিকিউ-লাস।—দাঁত চেপে 'ডি'-টায় জোরালো স্বরাঘাত দিয়ে 'কি'-টাকে অ্যাসপিরেটেড করে সাহেবি কায়দায় উচ্চারণ করল অজিত। অর্থাৎ রিড্‌ডিকিউলাস। করতেই পারে, সামার ইনস্টিটুট করা লোক!

—আমি লিট্যারেলি বলি নি। আসলে—

—আসলে-নকলে নয়, যাবে, না যাবেনা, সেটাই বলো।

—কমলা আর তোতন যাক, টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

—আর তুমি? বিছানায় বসে-বসে কবিতা ফাঁদবে? তাতে ঐ রিসেশনই হবে। কোথায় ময়ূরাক্ষী নদী, কংসাবতী, টেরাকোটা, কাঁকড়াঝোড়, অ্যাট লিসট দিগন্তটা কাকে বলে তার একটা ফার্সটহ্যাণ্ড নলেজ, আর কোথায় একটা ঘুপচির মধ্যে—

—মনোরথ গতি মোরে দিয়াছেন বিধি, মাইকেল তো পড়া আছে। সুতরাং চোখ বুজলেই চৌ—টুঁই টুঁই—ব্যাস, বাঁকুড়া, হয়ে গেল।—গম্ভীর তিপ্পান্ন বছর বয়েসে ঠোঁটমুখ দুমড়ে আনাড়ি হরবোলার মতো এফেক্ট মিউজিক বাজিয়ে দিই।

—কী ইয়ার্কি হচ্ছে—হাসতে-হাসতে হাসিটাকে গোঁফে-লেগে-থাকা দুধের মতো মুছে নিল অজিত : চলো না, যাই। একটু বেরোও তো ঘর থেকে। আরে, কনডাকটেড ট্যুর তো হয়েছে কী। তুমি ওটাকে অন্যভাবে নিতে

পারছ না? সর্ট অফ আ সিম্বল, আ সাজেশ্চন? একদিকে ভাস্ট আন-চার্টেড স্কাই, কংসাবতী, প্রাইমিত্যাল ন্যাচ্‌রাল ব্যাকড্রপ, অন্যদিকে মানডেইন রিয়েলিটি, কী দারুণ কনট্রাডিকশন বলো তো—অজিত বেশ আক্রান্ত হয়ে উঠছিল, বলতে-বলতে বলার মেজাজে তুঙ্গে উঠে যাচ্ছিল ওর গলা।

—আর না, পৌনে এগারটা বেজে গেছে। এবার গামছা নিতে হবে।—ওর কথা কেটে দিয়ে এবার সত্যিই আমি উঠে দাঁড়াই।

—তাহলে যাচ্ছো না?

—কী হবে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে।

—একে সুস্থতা বলে?—নাকে হাসল অজিত: ঠিক আছে। এই নাও, তিনটে আছে।—অজিত গোমরা মুখে পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিল: পড়ে দেখিস। রোববার দিন ফেরত দিস, উইথ ইয়োর কমেণ্টস। শালা, পাউণ্ডের বাচ্চা। কেটে-কেটে একেবারে ফাঁক করে দিলে গো আমার ওয়েস্টল্যাণ্ডের ম্যান্‌সক্রিপট!—অজিত সহাসা এবং সছত্র প্রস্থান করল।

আর আমি প্রায় ছত্রিশঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সেই অপার্থিব থ্রি-ডি পেয়ে গেলুম। অজিত, হায় বুঝি তার খবর পেলে না। সেদিন সন্ধের পর বাড়ি ফিরেই লিখে ফেললুম:

গিয়েছিলাম কনডাকটেড ট্যুরে একদা মুকুটমণিপুর…
কংসাবতীর পাড়ে শেষবিকেলে ভবিতব্যের মতো
আকাশে হঠাৎ মেঘ, কেউ যা দেখে না, শুধু যে দেখার সেই
দেখতে পায়, সন্ধে হল। সন্ধে হয় ঠিক সেখানেই
যেখানে বাঘের ভয়, সন্ধে হল মুকুটমণিপুরে।

৬॥ এবং চিৎপুরও

মোট কথা, মনখারাপের অ্যানাটমিটা একরকম দেখানো গেল হয়তো। হঠাৎ মেঘ, বাঘের ভয়-সন্ধে হয় প্রবচন, মেঘের মধ্যে ব্যক্তিগত বিষাদের অনুষঙ্গ—একটার পর একটা কলমের ডগায় আসতে থাকল তরতর করে।

এমনকী নায়িকাকে যখন মনে হল ডাকাতের মতো পরাক্রান্ত, অথচ নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থী, তখন স্বতই মনে এসে গেল ফুলনদেবী, চম্বল, এবং আশা ভোঁসলের যৌনগন্ধী অন্ধকারমথিত শীৎকৃত গলায় সেই বিখ্যাত 'বেরিলি বাজারমে ঝুমকা গিরারে'র আহ্লাদি আক্ষেপানুরাগ, কপালে-হলদে-ফেট্টিবাঁধা সাধ্‌না শিবদাসানির ঠোঁটে—'মেরা সায়া'র সাধ্‌না, সুন্দরীতমা, আমাদের প্রাক্তন যৌবনের হৃদ্‌স্পন্দন, তো সেই ঝুমকো স্খলিত হয়ে পড়ল মেঘ থেকে, যেটা মেঘ নয়, কিন্তু মেঘের মতোই বর্ষাপ্রবণ, বর্ষা মানেই নীলিমা সেনের মেলানকলিক ছায়াচ্ছন্ন আর্তি, 'সখী আঁধারে একলা ঘরে মন মানে না', স্মৃতির নৈঃসঙ্গ্য, একটার সঙ্গে একটা, আর-একটা, আরও-একটা, পরপর স্রোতের মতো আসতেই লাগল এবং—

এবং একসময়ে হুঁশ হল, না, এবার থামা দরকার। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যেন। কবিতা নয়, কাব্যিয়ানাম্ন লাইনগুলো, শব্দগুলো খিকখিক করতে পারে আরো এগিয়ে গেলে, নাকি, হয়তো ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে সেটা, সুতরাং রুখে দিয়ে টোন বদলে দিলুম:

কংসাবতীর সেই আয়োজিত বৃন্দগান থেকে
প্রতিবর্তক্রিয়া শুরু হল।
কিছুটা লাক্সারি বাসে, মানসপুষ্পকে চেপে এবং কিছুটা
কবিতার খশড়ায়।

মোট কথা, এবার দ্বিতীয় বিষাদের অ্যান্টিক্লাইম্যাকস-এ কবিতাকে নামিয়ে আনতে হবে, আনতেই হবে। শাস্ত্রবিরোধী, বে-লাইনে প্রেম-ভালোবাসার ছোঁকছোঁক, জুগুপ্সা ও কালক্রমে তার ধোঁয়া-পরিণতির কমিক্যাল বাস্তবতা এবং বাস্তবতার ঝাড়পিটকে অস্বীকার করি কী করে। আর সেই তুমুল ঝাড়ে ওসব দুঃখ-টুঃখ দূরস্থান, নিজের পিতৃপরিচয়ও ভুলে যেতে হয়। জয়দেবের দোকানে কেরোসিন এলে জেরিক্যান হাতে নিয়ে ছুটে যাই যখন, তখন এ জিনিশ হাড়ে-হাড়ে টের পাই। এটাই আমার স্বস্থান। সুতরাং মুকুটমণিপুর থেকে চিৎপুরে আসতেই হবে। আর বলাই বাহুল্য, চিৎপুরেরই আর-এক নাম জয়দেবের কেরোসিনের দোকান ও উল্লোল বি-লাইন।

অতএব সময়ের অনিবার্যতাকে দেখানো দরকার হয়ে ওঠে। আবার কিছুটা রেড-হেরিংসও চাই, গোয়েন্দাগল্পে যেমন মাঝেমধ্যে পাঠকদের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, একটু কৌতুক, জাদুকরের খাজুরে গল্পগাছা আর তলেতলে খেলা-সাজানো যেমন, সেভাবেই লাক্সারি বাস, মানসপুষ্পক, বড়বাবু, বড়বাবুর অফিসিয়ালিজ্‌-এর ভেতর থেকে চৈতন্যের উৎপ্রেক্ষা বের করে নেওয়া—এসব প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। লিখে ফেলি ঃ

কংসাবতীর সেই আয়োজিত বৃন্দগান থেকে
প্রতিবর্তক্রিয়া শুরু হল।
কিছুটা লাক্সারি বাসে, মানসপুষ্পকে চেপে এবং কিছুটা
কবিতার খশড়ায়। চোখে পড়ল উপনগরের
নতুন-নতুন বাড়ি, মার্কারি ভেপার জ্বলছে, মেট্রোগলিটান বাইপাশ ···
কাজেকর্মে ভুল হচ্ছে। বড়বাবু ভালো লোক, কাঁধে হাত রেখে
সাবধান করে দেন, সেদিন তো খুব খাওয়ালেন।
গ্লাস ঠোকাঠুকি হল। অতঃপর তিনিই আমায় বলেছিলেন ঃ
'বিষাদ ভোলার জন্যে দরকার দ্বিতীয় বিষাদ।
মৌরিগ্রামে কেরোসিন ট্যাঙ্কারে বোঝাই হচ্ছে, শোনো,
কাল একবার খোঁজ নিয়ো জয়দেবের দোকানে, কেমন ?'

(প্রতিবর্ত। দেশ। ৩০.৫.৮৭)

লেখা শেষ হল। আহ্‌, অনেকটা হাল্কা লাগছে শরীর। অতঃপর হাস্পিকে কাছে টেনে নিয়ে রাক্ষুসে আদরে চটকাতে থাকি। ও কী সুন্দর ভ্যাঁ করে কেঁদে দেয়।

এবং শৈশবে, পর্যটনের অনিকেত বারান্দায়

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

পর্যটনের বারান্দা জুড়ে রোদ পড়ে আছে, আকাশে স্বেচ্ছাচারী মেঘ,
এখানে জঙ্গলের কোন সহজাত প্রতিভা নেই ; নেই সম্ভ্রম
জঙ্গলে স্রেফ জঙ্গল। এ জঙ্গল নেহাতই তৃণভোজী,
ঈষৎ উল্কোখুল্কো, উত্তরাধিকারহীন।
গাছের মধ্যে আছে গাছ, তারমধ্যে বল্মীক, পায়জামার ঢিলেঢালা ছায়া
এজঙ্গলে বার্ধক্য আছে। আছে খোলা বনেটের পাশে রুগ্নচিতার লাফ
গণ্ডোয়ানা পাথরের বিদ্রোহ, এক ক্লান্ত বিদূষক ···
বাংলোর হাতায় আউটপোরে সিলভারফার্ণ, গ্লাইসিরিডিয়া।
বিনীত কাছাগলায়,
তাদের অসামান্য মাথাতে মাথাতে খানিক সবুজ ভিক্ষা করে পসথুমাস রোদ।
আকাশে মেঘ, ঢাকা পড়ে ম্লান সূর্যদেব। রোদ্দুর এসে বলে যায়
'অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দুঃখিত'। পুরোহিতরা উপড়ে নিয়েছে চোখ,
প্রাতরাশ ফেলে এ বয়েসে জঙ্গলের তবু চাই কানামাছি খেলা।
কাছেপিঠে জনবসতি নেই, মাঝেমধ্যে ইন্‌স্টলমেণ্টে হাওয়া-টাওয়া দেয়।
ওড়ে এঁটোপাতা, মৃত চড়ুইভাতি ···· হেমন্তের বিষাদে
সাঁওতালী মাচায় ওড়ে ধূলোর প্রণিপাত, যেন বা কবির জন্মদিনের মঞ্চ।
হাওয়া দেয়, গ্রামে ও শহরে।
মধ্যরাতে দলমা থেকে অকস্মাৎ ডেকে ওঠে হাতি। কাকে ডাকে হাতি ?
শালপিয়াসালের ডালে আলপটকা তন্ময় মাদকতা।
কাকে ডাকে ?—নিজেকে ?
এখানে শব্দের, এমনিতরো, অতর্কিতে, কোন আবোলতাবোল বিক্ষোভ নেই।
মধ্যরাতে, মশারীর ছতরির পাশে নেই শব্দের এমন ঘনিষ্ঠ বসবাস, প্রশ্রয়।
বহুরাত্রির ঘুমকাঁধে, শব্দ চলে গেছে নির্বান্ধব
শীতের বিবর্ণ গৈরিক পাতা ভেঙে ভেঙে, শুকনো বর্ণার পাশে ;
কঙ্করময় পাষাণের দেশে। উপলের বিস্তীর্ণ বিষাদে।
বিষণ্ণ পিউপার মত এখানে নামে কুয়াসার কুঞ্চিত উচ্ছ্বাস।

মাঠে ছত্রাকার, ছেঁড়াখোঁড়া
কার যেন মেরুন ট্রাউজার্স, শায়ার লেস, নৈঃশব্দের শতরঞ্চি।
এদিকওদিক কিছু অবাধ্য টিলায় আগাম সূর্যাস্ত,
তেড়ার পেটের লোমের মতন আছে কিছু গাদাগুচ্ছের কাচ্চাবাচ্চা ঘাস।
সিরুয়ালঘাসে সাগিনা মাহাতোর সবুজ বোতল, তাড়ির ভাঁড়, ভাঙাকলস—
এ জঙ্গলে আছে যেন এক নিগ্রোরমণী, মহুয়ায় বুকচাপড়ান মাতাল ভালুক।
আছে দ্রোণাচার্যের মেধাবী আলখাল্লা—শব্দের কোষমুক্ত তরবারীতে
বিষণ্ণ খোলসের দাগ ·····ক্ষমাহীনরক্ত
এ সমস্ত জঙ্গলে-বাদাড়ে চুঁড়লে কবি-টবি ঢের পাওয়া যাবে,
পদ্য যাবে না।

স্তব্ধতার থই থই চাতালে, রক্তের মধ্যে পাওয়া যাবে না
বিবাহরাত্রে বধূর ভুল বাসে উঠে পড়বার মত কিছু কাঁটাছেঁড়া ক্ষত।
এ জঙ্গলে নেই উপগ্রহের ক্রমাগত ভাঙচুর, ধূলোর সিন্থেটিক বিষাদ,
আর নেই শব্দেই
এখানে একবার 'যাবো' বললে, হুটহাট
বেড়িয়ে পড়া যায়। কোন বিপরীতমুখী টান নেই,
নেই কোন শস্যাল অহঙ্কার, বিপর্যস্ত মন্দির মসজিদ
—কিছু নেই, কিছু নেই
এ জঙ্গল সর্বাত্মক কাঠখোট্টা, কৃপণ—এখানে দুটো ভিক্ষাও মেলে না।

হাওয়া দিলে, শিউরে ওঠে আমাদের ইউপ্যাটার্নের বারান্দা—
সঙ্গে মেশে চারমিনারের গন্ধ, প্রেসারকুকারের আবছা হুইসেল।
হাওয়া দেয়। আমাদের বারান্দার তক্তাপোশে জমে নৈঃশব্দের মজলিস।
ধরা যাক নিবন্ত লণ্ঠনের পাশে প্রৌঢ়ের উপুড় হওয়া ক্রন্দন·····
···ঘরময় দেওয়ালি পোকার ওড়াওড়ি···শিশুর বাড়ানো হাতে নীল নিঃশব্দ সান্ত্বনা।
তেমনি, তেমনি আমরা এই চারবন্ধু—
যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ এই চারবন্ধু, ফিরে যাই
শ্মশানের সেই ছলুস্থুল, খাসরঘরী নাচে। এবং শৈশবে।
বার্ধক্য থেকে আমরা ফিরে যাই শৈশবে, ফিরে যাই
শৈশবের স্মরণীয় সান্ত্বনার উত্তাপ পেতে। যেমন ভাবে,
বাণিজ্য সেরে গুমটিতে ফেরে কলকাতার শেষ ট্রাম·····

একে একে মুছে যায় ঘর-দোর, দেয়াল। অন্ধকারে শুধু
জেগে থাকে হিরন্ময় জানালা, পর্যটনের অনিকেত বারান্দা—
জ্যাজ সিম্ফনি নয় কিংবা নয় বিটোফেনের কোন বিষণ্ণ অ্যালেগ্রা,
আমাদের রেকর্ডারে, লংপ্লেয়িংয়ে বাজে সেই অমোঘ উদ্দীপ্ত স্বর—
'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে ··
বুকের গভীরে চলে বসন্তোৎসবের আয়োজন, শীতের বিবর্ণ পাতা মৃত্যুর
কাছাকাছি, নৈঋর্তে·····

খানিক প্রতীক্ষাকামী সময়, ট্রেতে অঢেল তোপ্‌সে মাছের ফ্রাই টম্যাটো সস,
নিঃশ্চুপ আলোর রুত, আমরা চারজন, সঙ্গ নিঃসঙ্গ এবং দেবব্রত বিশ্বাস।

আমরা যে শেষ কবে

আমরা যে শেষ কবে দল বেঁধে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম, তা আর
মনেই পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, পাষাণ প্রতিমার গায়ে
দুর্বোধ্য উপলে সেই ভুল বানানের মিনতি 'হিমাদ্রীর ফাঁড়া কেটে যাক।'
কে হিমাদ্রি? কিসেরই বা তার ফাঁড়া? কতদিন মনে হয়েছে
পথে ঘাটে কোন বিষণ্ণ, বিপর্যস্ত মানুষ দেখলেই, কাছে গিয়ে
জিজ্ঞেস করি 'আপনিই তাহলে হিমাদ্রি?'—হয়তো সে এক কবি,
তাকে নিয়ে তো কোনদিন বি. বি. সি, রয়টারে স্পেশাল বুলেটিন
বের হবে না, কিংবা 'কলকাতার কড়চা'য় কৃশকায় কলমেও সে অযোগ্য।
পীতাভ বিষাদের নিরক্ষর অনুবাদ হাতে সে হারিয়ে যাবে
দূরে····· দিগন্ত রেখায়····· সেবারই তো, চাতালে কুড়িয়ে পাওয়া সিকি
অন্ধ ফকিরের হাতে দিলে সে বলেছিল 'খোদা মেহেরবান, খোদা মেহেরবান'।
পাথরে অদ্ভুত রহস্যে জ্বলজ্বল করছিল সেই ভুতুড়ে লাইন 'হিমাদ্রীর
ফাঁড়া কেটে যাক।'
একটু আধটু বৃষ্টি হয়েছিল। দু-এক ফোঁটা জল কি সেই পাথরের সাক্ষাৎকার
নিতে জানে?

জানালা দিয়ে রোদ্দুর এসে ফুল আঁকা তোরঙ্গে রাখে পশমী উচ্চারণ।
বারান্দায় অর্কিড, বহুদিন আগেকার তোলা গ্রুপফটো,
অর্ধেক কপাল জুড়ে রৌদ্রের তনুজা। রোদ্দুর দেখে মনে হয় বৃষ্টি পড়েছিল।
দূরদর্শন ঘোষিকার হাসি, খুতনীর মীড়ে জেগে ওঠে বিষাদ, পলাতক স্বপ্ন।
জেগে ওঠে সোয়ান লেকে শীতের এলোমেলো পর্যটন।
শেষ যে কবে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম তা মনেই পড়ে না।

ধানসিড়ি

কবিতার মায়াকানন

সম্পাদনা ঃ দীপক কর

১৮, বাড়মাণিকপুর, মেদিনীপুর-৭২১১০১

এখনও পর্যন্ত

শিবশম্ভু পালের একটিই মাত্র কাব্যগ্রন্থ

ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়

যা হয়তো কারো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকতেও পারে।

প্রকাশকাল ১৯৬৯

প্রকাশক ঃ সাহিত্যপত্রগ্রন্থ

৯, কাশী ঘোষ লেন, কলকাতা-৬

□ প্রবন্ধ

আপাতসাফল্যে কবিতা ঃ কবিতার ক্রান্তিকাল

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বহিরাঙ্গিক বিবেচনায়, আপাতবিচারে প্রবল উত্তেজের জোয়ারে কাটছে সাম্প্রতিক কবিতার অস্তিত্ব। আনুপূর্বিক বিন্যস্ত হলে তার লক্ষণগুলো কিংবা উৎসকারণ যা দাঁড়াবে, তা নিতান্ত কম নয়, নগণ্য নয় ঃ আবৃত্তিযোগ্য কবিতার প্রসার ও প্রচার ঈর্ষনীয়ভাবে উল্লিখিত হতে পারে ; পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে 'কবিতা-উৎসব' পালনের তাড়না এক আধুনিকতম রেওয়াজ ; কোনো-কোনো সাহিত্যপত্রের সিংহভাগ, নিদেনপক্ষে একটা নির্দিষ্ট অংশ কবিতাচর্চায় নিবেদিত ; প্রসারিত দীর্ঘ কবিতাও হালের একটা নিয়মিত অভিজ্ঞতা ; কোনো-কোনো কবি অথবা কবি-পত্র বিচ্ছিন্ন কবিতাংশে মতটা বিশ্বাসী, সম্ভবত তার থেকেও বেশি আস্থাবান গুচ্ছ কবিতার প্রয়াসকর্মে ; কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশনায় উদ্দীপনা ও কাট্‌তিও নেহাত অনুল্লেখ্য নয় ; 'বেস্ট সেলার'-এই তক্‌মা সপ্তাহান্তে কোনো-কোনো কবিতার বইকেও স্পর্শ করতে দেখা যাচ্ছে ; এবং সেই সঙ্গে সংকলিত-সম্পাদিত কবিতা-গ্রন্থও তেমন পিছিয়ে নেই ; স্ব-নির্বাচিত মনোনয়নের দায়ও বর্তেছে কোনো-কোনো কবির ওপর ইতিমধ্যেই ; আজকের হুজুগ-সর্বস্ব ক্যাসেট-কাল্‌চারও নিষ্কৃতি দেয়নি তাঁদের, স্ব-কণ্ঠে আবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা রেকর্ডের দাক্ষিণ্যে ; 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' পর্যায়ে উঁকিও দিয়েছেন কেউ-কেউ অনেকেই, এমন কি মধ্যমমানের যাঁরা, তাঁরাও ; কবিতার ওপর আলোচনা-প্রবন্ধ-স্মারক বক্তৃতামালা—তাও পড়ছে উপচিয়ে। এবং সব ছাপিয়ে যে ভয়ংকরতা আগামী দিনের দুশ্চিন্তা ও আশংকার খোরাক হয়ে উঠবে বলে মনে হয়, একটা বিরাট, অনিবার্য প্রশ্নের আকারে তা রাখা যাক ঃ নানা শ্রেণীর, বহুজাতের ও অনেক মেজাজের সাহিত্য-শাখার মধ্যে কবিতা-চর্চার রেওয়াজটাই কি তাহলে 'সহজতম' মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হতে চলেছে, অথচ তার জন্য নিবেদিত প্রয়াস কোথায়,

অনুশীলিত শিক্ষা কোথায়, বোধের মাত্রা কতটুকু, কতটুকুই বা সমাজলগ্নতা কিংবা পাঠকের সঙ্গে লেনদেন, বোঝাপড়ার তাগিদ, আন্তর প্রেরণা ?

প্রশ্নটা প্রশ্নও বটে, তার মধ্যে বীজ রয়েছে অফুরন্ত তর্কেরও। তাহলে কি কবিতার এই আপাতশুভ মুহূর্তটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, অভিনন্দনীয় নয় ? নাকি এরই অগোচরে সে একটা ক্রান্তিকালের সম্মুখীন, সংকটের সাক্ষী, বিপর্যয়ের মুখোমুখি ?—'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়'—পঞ্চাশের এক বহুপ্রজ কবির উপলব্ধ উচ্চারণের কাছে দায়বদ্ধ হয়েই এ-কথা লিখতে হল। আগামী কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে তো অনেকেই অনেক বাক্য ব্যয় করেছেন, জ্ঞাপন করেছেন মূল্যবান অভিমত, যার কিছু আশাব্যঞ্জক, দ্বিধান্বিতও হয়ত-বা। একটু অতীত নির্ভরতায় সুধীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে উদ্ধার করি তাঁরই কথা : সম্প্রতি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হয়েছি। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু সেকালের যে-সব তরুণ কবিদের মধ্যে আমরা অনেক সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলুম তাদের অধিকাংশই অন্তত আমার আশাভঙ্গ ঘটিয়েছেন। তবে এই অভিযোগ শুধু বাঙালী কবিদের সম্পর্কে খাটে না, আজকালকার পাশ্চাত্ত্য লেখকেরাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন।' আবার অন্যদিকে প্রয়াত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিতে এক স্পষ্ট প্রত্যয় : 'আধুনিক কবিতা, যা যথার্থ অর্থেই কবিতা, ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। তার শিকড় অনেক গভীরে, এবং সেই কারণেই তার ভবিষ্যৎ থেকে যায়। আমি কবিতার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড আস্থা রাখি।' আরো বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে আশ্বাবান শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হতে পারি না। যেমন জানি না নিজেরই বা ভবিষ্যৎ কি ? ভালো কথা বললে, জ্যোতিষশাস্ত্র ও হাত দেখায় আমি সন্তুষ্ট, নচেৎ নয়। তাই যদি কেউ বলেন আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আমি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধ ও মূঢ়ের গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেব। ঐ আমার গায়ের জোরে উত্তর দেবার রীতি', ইত্যাদি।

এ-সব হল বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত মতামতের মিছিল, কবিতার অনাগত আগামী সম্পর্কে অভিমত পোষণের উত্থান-পতন, টানাপোড়েন, হিসেব-নিকেশ। এই মুহূর্তে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত অভিলক্ষ্য কিন্তু মতের বৈচিত্র্যকে ততখানি

গুরুত্ব দেওয়া নয়, যতখানি ঝোঁক দেওয়া সৎ ও সার্বিক মূল্যায়নের ওপর ; ভবিষ্যৎকে নিয়ে ততখানি উত্তেজিত হওয়া নয়, যতটা ফুটিয়ে তোলার গরজ কবিতার সাম্প্রত আলেখ্য, তার বার্থতা ও সংকট, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, সংহতি-অসংহতি, অসফলতা-সিদ্ধি। তবু মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়াতে হয়—প্রাবন্ধিক কিংবা আলোচক ছাড়াও, স্বয়ং কবিরা—প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল কেউ কেউ, নয়ত বিগত প্রজন্মের প্রাতিষ্ঠানিক কবিব্যক্তিত্বের সেই তাঁরা—কবিতার আধুনিক জল-হাওয়া, চেহারা-চরিত্র, মন-মেজাজ নিয়ে কে কেমন ভাবছেন, ভাবাচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন সদর্থক ফলপ্রসূ কিছু নিশানার।

প্রসঙ্গটা শুধু তরল চাহনিতে উঁকি দিয়ে যাবার মত নয়, ভাবিয়ে তোলারও বটে। মাহেন্দ্রক্ষণ না ক্রান্তিকাল—কোন্‌টা আজ কবিতার সামনে হাজির ? আপাতসাফল্য না সুদূর সিদ্ধি—কোন্‌টায় সমর্পিত হতে যাচ্ছে কবিতার ভবিষ্যৎ ? সাহিত্যশাখার মধ্যে অবলীলায় এই যে সহজতম মাধ্যম বনে যাচ্ছে কবিতা, পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে ছাপিয়ে যাচ্ছে সবকিছুকে সে, উৎসবে-আয়োজনে আন্দোলিত হয়ে চলেছে তার সার্বিক অস্তিত্ব,—এসবই কি অভিপ্রেত ছিল কোনোদিন ? সৎ কবিতার বিনিময়ে অঞ্জলি ভরে এসবই কি চেয়েছিলাম আমরা কখনো ? 'কবিতা-সন্ধ্যা' ? কিন্তু এই 'সন্ধ্যা' কি ঘনতর অন্ধকার ডেকে আনছে না আড়ালে-আবডালে ? বিপন্ন বিস্ময়ের 'অদ্ভুত আঁধারে' একদিন নৈঃশব্দভেদী 'উটের গ্রীবার মতো' আক্রমণ কি ঠেকানো যাবে এতে ? অথচ এত আনুষ্ঠানিক উত্তেজনার সুবাদে কবিতার সত্যিকারের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? এ বড় আশ্চর্য সময় যখন কবির সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান, কিন্তু তার 'রিডারসিপ' ? আরো আশ্চর্য ঠেকে, ঘটনাটা সংশয়ই জাগায়, তবে পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে শ্রোতা-ঠাসা 'কবিতা-উৎসব' কিসের ইঙ্গিত ? কিন্তু 'শ্রোতা', না 'দর্শক' ? উচ্চারণযোগ্য স্মরণীয় কবিতা শোনা, না কি জনপ্রিয়তার শিখরে আসীন কোনো-কোনো কবিকে চাক্ষুষ দর্শনের রোমাঞ্চ উপভোগ ? এতে 'রিডারসিপে'র—শোনা বা দেখা কোনোটারই নয়—তারতম্য ঘটছে কি ? আবার এর পাশাপাশি আরো একটা সত্য যাচাই করে নেওয়ার মত। খাঁটি অর্থে সৎ কিছু কবি এসব উত্তেজনার উত্তাপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চান কেন ? দূরে সরে গিয়ে অনাক্রান্ত রাখতে চানই বা কেন নিজেদের ?—এই নিস্পৃহ ভূমিকায় কিসের সংকেত ?

তাঁরা কি আস্থাবান বা বিশ্বাসী নয় এসবে? বীতশ্রদ্ধ, বিতৃষ্ণ? মেলে না উত্তর।

কাব্যসভায় যোগদানের জন্য আহবান এখন আর স্বদেশের চায় দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রায় বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে। এও আরেক রেওয়াজ, সাম্প্রতিক প্রবণতা। এবং বিদেশ থেকে ফেরার পর সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে ফলাও করে প্রতিবেদনের প্রতিযোগিতা; এমন কি ক্যামেরাবদ্ধ ছবিসহযোগে। আর এই প্রতিবেদন প্রকাশের বাহন? খানদানী সাপ্তাহিক / পাক্ষিক পত্রিকা তো কিছু আছেই, এসব নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হতে যাদের বিন্দুমাত্র অরুচি নেই; বরং এসব লেখার সূত্রে 'খ্যাত' হতে পারলে তাদের বাজার-দর আকাশছোঁয়া। ধারাবাহিক রচনার কল্যাণে গড়ে ওঠে কিছুদিনের খোরাকও। এবং গ্রন্থস্থ হবার লগ্নে এসব তকমা-আঁটা লেখায় বেড়ে যায় সূচির কলেবরও।

কিন্তু এতসব বাণিজ্যিক প্রচার-প্রসারে কবিতার স্বকীয় চরিত্রের কি হচ্ছে? বাড়ছে কি তার নিজস্ব নির্মাণের মান? বিগত দশকগুলোর সেইসব উজ্জ্বল কবিব্যক্তিত্বের পরিমাপে কি আর কেউ উঠে আসছেন তেমন আপনতায়, প্রচণ্ড প্রভাবসম্পাতী কেউ কেউ? সত্যিকারের ক'জন সৎ কবিতার অনুভবে বিদ্ধ হতে ভীড় জমাচ্ছি জমকালো 'কবিতা-উৎসবে', কি 'কাব্যসন্ধ্যা'য়, কিংবা 'অমুকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছুক্ষণ' কাটাবার আনুষ্ঠানিকতায়? পাঠককবি ছাড়া শ্রোতাদের (দর্শকদেরও সেইসঙ্গে) মধ্যেই বা ক'জন কবিতাসম্পন্ন কবির জমায়েত? ভাববার বিষয়। ভাববার বিষয়, এত হুজুগে জনতা, এত আয়াসহীন পাঠক, এত অনর্গল শ্রোতা, এত আয়োজনিক অনুষ্ঠান, এত কৃত্রিম ভীড়ভাট্টা কবিতা নিজেই কোনোদিন চেয়েছিল কিনা। চিন্তার বিষয়, এক চাঁদোয়ার নিচে এতগুলো লোক অবলীলায় এবং উত্তেজনায় বুঝে-শুনে একটার পর একটা কবিতার অবরুদ্ধ দরজা-জানলাগুলো খুলে ফেলছে কি করে? তাহলে কি কবিতার সেই কুহেলি-রহস্য সহজভেদ্য হয়ে গেল? খোয়া যেতে বসেছে তার সম্ভ্রম, আভিজাত্য, বনেদি ঘরানা? বিকিয়ে যেতে বসেছে সে হাটে-মাঠে?—অত সহজে মেলে না এর উত্তর।

মঞ্চাটে প্রস্থিত হবার মুহূর্তে আর এক অযত্নের ছাপ চোখে পড়ছে ইদানিং,—কবিতার নির্বিচার নির্বাচনে। বলাই বাহুল্য, সকলের বেলায় নয়, কারুর

কারুর ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি যদি হ'ন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কবিব্যক্তিত্ব, তখন? তাঁর যে কবিতা-কণিকা ঠাঁই করে নিয়েছিল প্রাক্তন কোনো গ্রন্থের আশ্রয়ে, তাকে আবার মোহবশে দু-বার, এমন কি তিনবার পর্যন্ত পরের কোনো বইয়ে ফিরিয়ে আনা কেন? দুর্বলতায়? স্বেচ্ছায়? নাকি অভি-নিবেশহীন দায়সারা মানসিকতায়? কে বুঝবে, কিভাবে বুঝবে কোন্ কবিতাটি তাঁর প্রথমতম উচ্চারণ, কোন্‌টাই বা পরবর্তী সময়ের? অথচ কবিতার সংখ্যাস্বল্পতা থেকে কি এই পুনরাবৃত্তি? তা তো নয়, বরং আমাদের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়েছে যে অতিউর্বরতাই তো সেই কবির বিশিষ্টতা। তাহলে? আর পুনরাবৃত্তি? ছ'গুণ্ডির সহযোগে যে কবিতার শরীর, তার মধ্যে অবিকল পুনরুচ্চারণে আক্রান্ত তিনটি ছত্র। সে কি নিছক পাদপূরণের গরজে, নাকি হেলাফেলায় তাড়াহুড়োর ছাপ,—খানিকটা জনপ্রিয়তার দায় মেটাতে? একে কি বলব, কবিতা নিয়ে সৎপ্রয়াসী চর্চা, স্বেচ্ছাচার কবিতাকে দু-মুঠো ভ'রে বিলিয়ে দেওয়া আর পাঁচজনের মধ্যে? অথচ অনাতর উপলক্ষে সেই তাঁর হাত থেকেই কুড়িয়ে পাচ্ছি সত্যতম উপলব্ধি, সবচেয়ে গাঢ় অনুভূতিমালা, আঙ্গিকের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ। তবে কেন এই সামঞ্জস্যহীনতা, সংগতিশূন্য মানসিকতা?—হিসেব মেলাতে মন রাজী নয়।

সেই অতীত কাল থেকে স্বীকৃত সাহিত্যশাখার এই সবচেয়ে স্পর্শকাতর মাধ্যমটির জন্য প্রয়োজন ছিল না কি আরেকটু নির্জনতার, আরো একটু নিভৃতির? আয়োজনবিমুখ আরো কিছু অনুশীলন, উৎসববিরূপ আরো অনেক সাধনার দরকারটুকু ভুলতে পারি কি আমরা? বোধহয় না। এবং 'না' বলেই কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয় আমাদের, আপাত-সাফল্যের তলিতার অন্তরালে একটা সংকটের কালো মেঘ যেন ঘনিয়ে আসতে দেখি। এটা নৈরাশ্যের কথা নয়, দুশ্চিন্তার সূচনা।

অথচ কত অতলান্তিক গভীরতায় একসময়ে পৌঁছে গিয়েছিল এই কবিতাই। কত অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হতে দেখেছি তার শরীরে, আত্মায়। কি নিবিড় অনুশীলন তার পেছনে সক্রিয় ছিল, ঘাম-ঝরা সাধনা থেকে উঠে আসত এক-একটা উচ্চারণের স্মরণীয়তা। চিরকালের মত, সব দেশকালের মত তার বোদ্ধা ছিল মুষ্টিমেয়, এবং তাই ছিল ঈপ্সিত, 'fit audience,

though few.' সেই পথ বেয়ে কবিতা আজ পাড়ি দিয়েছে অনেক, কিন্তু সেইসঙ্গে তার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে দিক্‌ভ্রান্ত হবার। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, 'কবিতা, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' প্রসঙ্গত, ১৯৫৫ সালে—'কবিতা' পত্রিকার দু-দশক অতিক্রান্ত হবার পর—বুদ্ধদেব বসুর লেখা "কবিতা'র কুড়ি বছর" নিবন্ধ থেকে একটি অনিবার্য ও অনবদ্য অংশ এখানে উদ্ধার করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না,

"'আদর্শ' কথাটা বড্ড কড়া, আঁটোসাঁটো, গম্ভীর; 'কবিতা' বের করার সময়, বা পরবর্তী কালে, আমাদের সামনে কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিলো, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে। যেটা ছিলো, সেটা মনের একটা ইচ্ছে মাত্র, খুব বড়ো কোনো ইচ্ছেও নয়;—কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান ক'রে দেবো, যাতে তাকে ক্রমশপ্রকাশ্য উপন্যাসের পর্দপ্রান্তে বসতে না হয়, কুন্ঠিত হ'য়ে থাকতে না হয় রঙ-বেরঙের পসরার মধ্যে, অনেক বেশি গলার-জোর-ওলা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে—যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় সধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে—এইটুকু মাত্র ইচ্ছা করেছিলাম।"

গাঢ়তম অনুভবে আক্রান্ত হবার মত এই যে সব পঙ্‌ক্তির বিন্যাস-নিপুণতা,

শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিল কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।
ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম আঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকার ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ
জানিবে না, কোনোদিন জানিবেনা; কলরব করে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়

—সিন্ধুসারস / জীবনানন্দ

কিংবা,

ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উত্তরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে—
ঘনমেঘনীল
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে

—বৃষ্টি / অমিয় চক্রবর্তী

অথবা,

ভুলে-যাওয়া গন্ধের মতো
কখনো তোমাকে মনে পড়ে।
হাওয়ার ঝলকে কখনো আসে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভাস।
আর মেঘের কঠিন রেখায়
আকাশের দীর্ঘশ্বাস লাগে।
হলুদ রঙের চাঁদ রক্তে ম্লান হল,
তাই আজ পৃথিবীতে স্তব্ধতা এল,
বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে যে কোমল, সবুজ স্তব্ধতা আসে

—বিস্মৃতি / সমর সেন

তার জন্য কোনোদিন কি কোনো 'কবিতা-উৎসব', কি 'কবিতা-সন্ধ্যা'র প্রয়োজন পড়েছিল? কোনো পোষাকী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নির্ভর করে কি এদের ব্যাখ্যা সাজিয়েছিলাম আমরা? অথবা এমন অবাঞ্ছিত দাবিও কি শ্লথ মুহূর্তে আমরা করতে পারি কখনো যে অনেক, অনেক পাঠক অনায়াসে এ-সব গভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ পঙ্‌ক্তির মর্মস্থলে পৌঁছে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল? কবি যেমন সকলেই নয়, কেউ কেউ; কবিতাও তেমনি সকলের জন্য নয়, কারুর কারুর জন্যই। এ বিশ্বাস কোনোদিনই আমরা সজ্ঞানে সর্বতোভাবে বিসর্জন দিতে পারব কি?

আমরা আগেই বলেছি এ-সব প্রসঙ্গ নৈরাশ্যের নয়, ভাবিয়ে তোলার। সব

দেশের সব সাহিত্যেই এমন এক-একটা বিবর্ণ সময় আসে, বিপন্নতার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যেতে হয় আমাদের, আক্রান্ত ও বিশ্লেষিত হতে হতেই আবার জেগে ওঠে কবিতা, ক্লান্তি থেকে পূর্ণতর পরিণতিতে পৌঁছবার সম্ভাবনা দেখা দেয় ওরই ফাঁকে। সেই 'কবিতা', 'পূর্বাশা', 'পরিচয়'-এর যুগে অনেক কৃচ্ছ্রতার অন্তহীন পথ পেরিয়ে কবিতার প্রকাশ ঘটত, আড়ালে অনেক শাসন আর শিক্ষার ভূমিকা ছিল; অনুশীলনের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হ'তে হত একজন কবিকে। নিঃসন্দেহে সে-সবের পালাবদল ঘটে গেছে, যেহেতু সাহিত্যে দৃশ্যান্তর অনিবার্য, রুচিরূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, প্রবণতার পরিবর্তন মানা। বাঞ্ছিত হোক, অপ্রার্থিত হোক, সহজ হয়ে গেছে কবিতা নামক মাধ্যমটি, সহজতর হয়েছে কবিতার মাধ্যমও। এইভাবে অজস্র কবিতার পথে চলতে চলতেই হয়ত একটা সামগ্রিক প্রবণতা ঠিকরে বেরোবে, নির্মিত হয়ে উঠবে তার চারিত্র, তার স্বাতন্ত্র্য, মুখোমুখি হতে পারবো তার পূর্ণতার সঙ্গে, তার আন্তরিকতম উচ্চারণের সঙ্গে। কবির সঙ্গে সঙ্গে কবিতাই হয়ে উঠবে মানুষের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার, প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্যে একটা অনিবার্য ভূমিকা সে তৈরি করে নেবে নিজস্ব গরজে, শিল্পিত স্বভাবে। অনেক অন্ধকারের মধ্যেও এই স্বপ্নটাকে মুঠোর মধ্যে একটু বাঁচিয়ে রাখা যাক না।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা-সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ

এক সময় দুই কবি

পপুলার লাইব্রেরী ।। ১৯৫/১বি, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

৫.৫০

প্রসঙ্গত কবিতা

মাঝি প্রকাশনী ।। ৭, সুকিয়া রো, কলকাতা-৬

পরিবেশক ঃ দে'জ বুক স্টোর্স

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

২০.০০

স্মরণীয়েষু ঃ সমর সেন

গত তেইশে অগস্ট ১৯৮৭-তে প্রয়াত হলেন সমর সেন। স্বেচ্ছানির্বাসনে কবিতার জগত থেকে রুমাল নেড়ে বিদায় নিয়েছিলেন চার দশকেরও বেশি, আরো নিঃশব্দে সব কিছুর নেপথ্যে চলে গেলেন এবার তিনি। কবিতার জগত রহস্যের জগত, কিন্তু সমর সেনের প্রাতিষ্ঠানিক কবিব্যক্তিত্ব বোধহয় আরো রহস্যময় হয়ে রইল আমাদের কাছে। কারণ কোন্ সত্যবদ্ধ অভিমানে ১৯৪৬-এর পর তিনি কবিতার পৃথিবীতে আর ফিরে এলেন না, এ প্রশ্নটা নিরুত্তর রেখেই তাঁর এই চলে যাওয়া। কোথাও কোনো ঘোষণা রেখে যাননি কিংবা কোনো কৈফিয়ৎ। হয়ত তাঁর কোনো অঙ্গীকারই ছিল শুধুমাত্র নিজের কাছে, যার সুবাদে কাব্যসামর্থ্যকে আর তিনি সম্প্রসারিত করতে চান নি, হয়ত ভেবেছিলেন বারো বছর ব্যাপ্তিতে মুঠো ভরে যা দেবার, তাতে পূর্ণচ্ছেদ টানার সময় হয়ে গিয়েছিল, হয়ত এমন বোধও আক্রান্ত করেছিল তাকে ঃ 'রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।' আমাদের বিষাদ অন্য জায়গায়। যে তিনি বিশ্বাস করতেন অনিঃশেষ কবিতায় ঃ 'পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই', সেই কবিই শেষতম উচ্চারণ রেখে গেলেন মাত্র তিরিশ বছর বয়সে পা ছুঁতে না ছুঁতেই। এ রহস্যের উন্মোচন আগামী প্রজন্ম করতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যারা কবিতার জগতে নিঃশ্বাস নিতে ভালবাসি, আমরা যারা চেয়েছিলাম তাঁর নিজস্ব ঘরাণার উচ্চারণে আরো ঋদ্ধ হয়ে উঠবে বাংলা কবিতা,—তারা পারলাম না এর সঠিক উত্তর সন্ধান করতে। কবি যদি দুঃখ পায়, কলকাতাও দুঃখ পেতে থাকে, আর এ তো প্রয়াণ, স্বেচ্ছা বিদায় স্বীকার করে নিয়েও এক বৃহত্তর বিদায়।

সমর সেনকে হারানো মানে কলকাতাকে হারানো, কলকাতার নিজস্ব একান্ত এক কবিকে আর না পাওয়ার শোক। এক নস্টালজিক দীর্ঘশ্বাস, এক ক্লান্ত আক্ষেপ। ভাষতে কষ্ট হয় মহানগরীতে আজো বিবর্ণ দিনের আসা-যাওয়া, আজো আমাদের সাক্ষাত ঘটে আলকাতরার মত রাত্রির সঙ্গে, কিন্তু

শহর নিঃস্বতর হয়ে গেল তাঁর আকস্মিক অবর্তমানে, নাগরিক মধ্যবিত্ত হারিয়ে ফেললো তার শেষ প্রতিভূ। আজকের অদ্ভুত আঁধারে যাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি সবচেয়ে কাম্য হতে পারত, কবিতার সংসারে যে আপোষহীন ব্যক্তিত্ব ঝলসে উঠলে বাঞ্ছিত মনে হত সবচেয়ে বেশি, তাঁর অভাব আমরা প্রতিমুহূর্তের নিশ্বাসের সঙ্গে অনুভব করব।

আগেই বলেছি মাত্র তিরিশ বছরে ঐচ্ছিক অবসর, এবং যা কিছু কবি-কৃতির ফসল তা স্থান পেয়েছে মাত্র ছ'টি গ্রন্থের আশ্রয়ে—কয়েকটি কবিতা, গ্রহণ, নানাকথা, খোলা চিঠি, তিন পুরুষ ও সমর সেনের কবিতা। 'পূর্বাশা'য় যখন প্রথম আবির্ভাব, কবিতায় তখনো তিনি গদ্যমুখী নন। এক বিশেষ চরিত্রের গদ্যের মোড়কেই যে তাঁর কবিতার আসল সিদ্ধি, এ প্রেরণা তাঁকে প্রথম পৌঁছে দেন বুদ্ধদেব বসু। এবং এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের শ্রদ্ধেয় মন্তব্য আজো স্মরণীয় : 'আমার ধারণা ছিলো গদ্যরচনায় ভালো দখল থাকলে তবেই গদ্যকবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। ..... এ-গদ্য গল্পে বা প্রবন্ধে ঠিক ব্যবহার্যই নয়; এ যেন বিশেষভাবে কবিতারই বাহন।' তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'বাবু বৃত্তান্ত'-তে তরল এক মন্তব্যের ফাঁকে সমর সেন বোধহয় এক গভীর সত্যের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন : 'কলকাতায় যাতায়াতের সময় ট্রামের গতিছন্দে কবিতার অনেক লাইন মনে দানা বাঁধতো—ট্রামের গতিছন্দ হয়তো গদ্যছন্দের মূলে ছিল।'

কবিতা থেকে হাত মুছে ফেলার পর ১৯৭৮-এ ঐ 'বাবু বৃত্তান্ত', চমকে দেওয়ার মত গদ্যের টানে সমর সেন। দেড়শো পাতার মত কৃশকায় একটি বই, আত্মকথা ছাপিয়ে, বুদ্ধিপ্রখর রম্য নিবন্ধ ছাপিয়ে অসামান্য গদ্যে যেখানে চর্চিত হয়েছে ফেলে-আসা জীবনের বিস্মৃত অধ্যায়গুলোকে নিয়ে জমা-খরচ হিসেব-নিকেশের বিরল তথ্য। এ হল সাংবাদিক ও গদ্যকার ব্যক্তিত্বের এক অনুপুঙ্খ আলেখ্য,—যে ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপোষ ছিল না, বিন্দুমাত্র সন্ধি ছিল না।

ইতিপূর্বে তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নাউ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪-র অক্টোবরে—তাঁরই এককালীন অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের প্রেরণায়। সে ইতিহাসের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত প্রাপ্তব্য ওই 'বাবু বৃত্তান্তে'রই পাতায় পাতায়। এবং এরপর ১৯৬৮-র নববর্ষে তাঁর 'ফ্রন্টিয়ার', তাঁর বাকি বিশ বছর জীবনের সংগঠনী হাতিয়ার, শেষ প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র, সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ,—যে আদর্শ থেকে তিনি মৃত্যু অবধি এক ইঞ্চিও নড়েন নি। মাঝখানে অনেক ঘাম-ঝরা কৃচ্ছ্রসাধনের কাছেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অনমনীয়।

যে-কোনো মৃত্যুই শোকাবহ। সমর সেনের শূন্যতা আরো বেশি করে অনুভূত হবে এই কারণে যে, আজকের দীর্ণ দুঃস্থ রাজনীতির টালমাটালে ছিন্নবিচ্ছিন্ন দুঃসময়ে এবং অস্থির উদ্দেশ্যহীন কবিতার সংসারে তাঁর মতো অকম্প নিরপেক্ষ সাংবাদিক-ব্যক্তিত্ব ও ঋজু কবি-চরিত্র আমাদের আরো অনেক দূর হাত ধরে পৌঁছে দিতে পারতো।

স. অন্তরীপ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

প্রবাহপথ ৭.০০ টাকা

অন্যান্য গ্রন্থ :

সীমান্তের কাঁটাতারে (কাব্যগ্রন্থ) ২.০০ টাকা

একটি দ্বৈপায়ন সভা : জে, এম, সিঙ্গ

(জে, এম, সিঙ্গ-এর নাট্যাবলির ওপর আলোচনা) ১২.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

প্রমা প্রকাশনী।

সীমান্ত। ৬-সি রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী, কলকাতা-৯ এবং

১৭টি রাণী ব্র্যাঞ্চ রোড, কলকাতা-২

অন্তরীপ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র
শারদ সংকলন ১৯৮৭ ।। তৃতীয় বর্ষ ।। তৃতীয় সংখ্যা

সূচি

☐ কবিতার নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনটি নিবন্ধ ঃ

বাঁকের মুখে পৌঁছেছি ঃ ব্রত চক্রবর্তী ৩

কবিতার ওসিঠ ঃ অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৯

যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি ঃ শিবশম্ভু পাল ২৯

☐ গল্প

শিয়াখালার বনমালী ঃ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪

☐ নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ঃ

সুনীলকুমার নন্দী রাত্রি ভট্টাচার্য তারাপদ রায় অমিতাভ দাশগুপ্ত
মণিভূষণ ভট্টাচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মতি মুখোপাধ্যায়
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সোমক দাস প্রমোদ বসু বিশ্বনাথ গরাই
কৃত্তিবাস রায় সুজিত সরকার সুভাষ মজুমদার শৈলেন্দ্র হালদার
কাশীনাথ বসু জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় দীপক কর ১৯-২৮

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫-৪৮

☐ প্রবন্ধ

আপাতসাফল্যে কবিতা ঃ কবিতার ক্লান্তিকাল
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯

☐ স্মরণীয়েষু ঃ সমর সেন ৫৭

যোগাযোগ
৫, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা-৩৭, দূরভাষ ঃ ৫৫-৫০০৭

☐ চার টাকা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ৫, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা-৩৭ হইতে প্রকাশিত ও 'জিকে এণ্টারপ্রাইজ' ৭২, পাইকপাড়া রো, কলকাতা-৩৭ হইতে মুদ্রিত।